ধর্ম
আদর্শ জীবনের আধার

Bengali Translation of Hindi Book
"Dharma: Adarsh Jivan Ka Adhar"

কল্যাণমিত্র শ্রীসত্যনারায়ণ গোয়েঙ্কা

ধর্ম

আদর্শ জীবনের আধার

Bengali Translation of Hindi Book
"Dharm- Adarsh Jivan ka Adhar"

কল্যাণমিত্র শ্রীসত্যনারায়ণ গোয়েঙ্কা
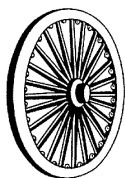
বিপশ্যনা বিশোধন বিন্যাস
ইগতপুরী

B02 - Dharm- Adarsh Jivan ka Adhar

First Edition : 2008
Reprint : January 2015

Price: Rs. 60/-

ISBN 978-81-7414-298-3

Published by:
Vipassana Research Institute
Dhamma Giri, Igatpuri 422 403
Dist. Nashik, Maharashtra, India
Tel: [91] (2553) 244998, 244076,
244086, 244144, 244440
Email: vri_admin@vridhamma.org
Website : www.vridhamma.org

Printed by:
Apollo Printing Press
G-259, SICOF Ltd., 69 MIDC, Satpur
Nashik-422007, Maharashtra

অনুক্রমণিকা

প্রকাশকের কথা

প্রকাশকের কথা

“ধর্ম ঃ আদর্শ জীবন কা আধার”— মূল হিন্দি পুস্তকের বাংলা অনুবাদ “ধর্ম ঃ আদর্শ জীবনের আধার”র প্রকাশ আমাদের আনন্দ এবং উৎসাহের বিষয়।

এই ছোট পুস্তকটি সরল ও সুরুচিপূর্ণ ভাষায় লেখা এবং এটি যে কোন সময়ে পড়ার যোগ্য। সাধারণ মানুষের উপযোগী এই পুস্তকটি গুরুদেব শ্রী সত্যনারায়ণ গোয়েঙ্কার দীর্ঘদিনের সাধনার অনুভূতি এবং ভাবনা চিন্তার ফল। তিনি মানুষের কল্যাণের জন্য গভীর বাৎসল্য নিয়ে তাঁর অন্তরের অনুভূতিকে অতি সরল ভাষায় বিতরণ করেছেন। এই পুস্তকটিতে তাঁর করুণা ও বাৎসল্য অনেক যায়গাতেই স্পষ্ট দেখা যায়। পাঠককে তিনি মুগ্ধ করে আকর্ষণ করতে জানেন। আমরা যে দুঃখী, এবং আমাদের স্বভাব অনুসারেই যে আমরা নিরন্তর দুঃখের সর্জন করে চলেছি, গুরুদেব তা জানেন। ‘নানক দুখিয়া সব সংসার’ — এই কথা তিনি বারবারই বলেন, কিন্তু উনি এটিও জানেন যে বেশিরভাগ লোক নিজেই তার নিজের দুঃখের জন্য দায়ী। গুরুদেব তাঁর এই ছোট পুস্তকটিতে এমন কয়েকটি উপায় বলেছেন যার ব্যবহারে আমরা এই স্বভাব থেকে মুক্তি পেতে পারি, নিজের সুখ শান্তির জন্য মনকে নির্মল করতে পারি এবং তাকে সর্বদা নির্মলই রাখতে পারি। গুরুদেবের বিশ্বাস, নির্মল মনই নিজের সুখশান্তির কারণ হয়, অন্যকেও সুখ শান্তি দেয়।

এই ছোট পুস্তকটি পড়ে আপনি জানবেন ধর্ম কি, শুদ্ধ ধর্ম কি, ধর্মের সার কি, এবং সেই সঙ্গে এও জানবেন যে ধর্মকে কিভাবে ধারণ করা যায়। এই বইটি সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা থেকে বাঁচতে শেখায় এবং আড়ম্বর ও কর্মকান্ডের রহস্য উন্মোচিত করে। ধর্মের যে ব্যাপক রূপ সর্বজনীন, সার্বভৌমিক ও সর্বকালিক রূপে স্বীকার্য তা আসলে প্রকৃতিরই নিয়ম।

প্রকৃতির নিয়মই ঋত, শুদ্ধ ধর্ম বা সত্য ধর্ম। এটি সম্প্রদায় থেকেও অন্তঃসারশূন্য কর্মকান্ডের সঙ্কীর্ণতা থেকে অনেক দুরে।

বিপশ্যনা সাধনামার্গকে বোঝার জন্য এটি সরল ভাষায় লিখিত একটি ছোট পুস্তক। এ কথা মনে করার কোন কারণ নেই যে পুস্তকটি কেবল সাধকেরই জন্য বা একটি বিপশ্যনা শিবির শেষ করার পরেই পুস্তকটি পঠনীয়। বিপশ্যনা সাধনার কোন শিবির না করেও কোন ব্যক্তি প্রারম্ভিক পুস্তিকা হিসাবে এটি পড়ে উপকৃত হবেন।

আজকের দিনে, একটি পবিত্র শব্দ 'ধর্ম'কে যখন নানা গোঁড়ামির পোশাক পরানো হচ্ছে তখন এই পুস্তকটির প্রকাশ আরও প্রাসঙ্গিক। এই সময়েই পুস্তকটি সাধারণ মানুষের অতি আকাঙ্খিত হতে পারে। যাঁরা ধর্মের বিধর্মী প্রচার দ্বারা বিভ্রান্ত হয়েছেন, এই বইটি তাঁদের চোখ খুলে দিতে পারে। প্রতি ঘরে এই বইটির প্রচার হওয়াই এখন প্রয়োজন। প্রতিটি ঘরে যেন এই বইটি পৌঁছে যায়, ঐ সঙ্গেই যেন পৌঁছে যায় শুদ্ধ-ধর্মের কথা, সত্য-ধর্মের কথা। ধর্মকে সহায় করে জীবন যাপনের শৈলী প্রত্যেকের জীবনের অঙ্গ হোক — এই মঙ্গল কামনার সঙ্গে পুস্তকটির প্রথম সংস্করণ প্রকাশ করা হ'ল।

বিপশ্যনা বিশোধন বিন্যাস

১
ধর্ম কি?

জীবন যাপনের শৈলীই হ'ল ধর্ম—নিজে সুখে বাঁচা এবং অন্যদের সুখে বাঁচতে দেওয়া। সকলেই সুখে বাঁচতে চায়, দুঃখ থেকে মুক্ত থাকতে চায়। কিন্তু প্রকৃত সুখ কি, এবং কিভাবে তাকে পাওয়া যায়—তা না জেনে আমরা মিথ্যা-সুখের পিছনে বিভ্রান্ত হয়ে ছুটতে থাকি। প্রকৃত সুখ থেকে দুরে থেকে আমরা আমাদের দুঃখই বাড়াতে থাকি। কেবলমাত্র নিজেকেই নয়, অন্যদেরও দুঃখী করি।

প্রকৃত সুখ অন্তরের শান্তিতেই আছে এবং অন্তরের শান্তি আছে চিত্তের বিকার-বিহীন অবস্থাতে ও চিত্তের বিশুদ্ধিতে। চিত্তের বিকার-বিহীন অবস্থাই প্রকৃত সুখ-শান্তির অবস্থা।

অতএব প্রকৃত শান্তি এবং প্রকৃত সুখ তিনিই উপভোগ করেন—যিনি নির্মল চিত্তে জীবন যাপন করেন। যিনি যতটা বিকার-মুক্ত থাকেন তিনি ততটা দুঃখমুক্ত থাকেন, ততটাই জীবন যাপনের যথার্থ উপায় জানেন এবং ততটাই প্রকৃত অর্থে তিনি ধার্মিক। নির্মল চিত্তের ব্যবহারই হচ্ছে ধর্ম। এটাই জীবন যাপনের কলা বা শৈলী এবং এতে যিনি যতটা নিপুণ তিনি ততটা ধার্মিক। 'ধার্মিক' শব্দের এটাই যথার্থ পরিভাষা।

প্রকৃতির এক অটুট নিয়ম আছে যাকে কেউ বলে সত্য কেউ বা বলে ধর্মনিয়ামকতা—নামের ভেদ থাকলেও তাতে কিছু যায় আসে না। নিয়ম হচ্ছে এই যে, এরূপ করলে তার এরূপ পরিণাম হবেই। এরূপ না করলে, তার এরূপ পরিণামও হতে পারে না। কারণের পরিণাম স্বরূপ যে কার্য সম্পন্ন হয়, ঐ কারণ না থাকলে সেই কার্য সম্পন্ন হতে পারে না। এই নিয়ম অনুসারে যখন আমাদের মন দ্বেষ, দৌর্মনস্য*,

---

* মনের দুর্ভাব বা কুভাব।

ক্রোধ, ঈর্ষা, ভয় প্রভৃতির দ্বারা আক্রান্ত হয়, তখনই আমরা ব্যাকুল হয়ে পড়ি। দুঃখ-সন্তপ্ত হয়ে সুখ থেকে বঞ্চিত হই। আর যখন আমাদের মন এইরূপ বিকার থেকে মুক্ত থাকে, তখন আমরা ব্যাকুলতা থেকে মুক্ত থাকি, দুঃখ-সন্তপ্ত হওয়া থেকে রক্ষা পাই এবং অন্তরের সুখশান্তির অধিকারী হয়ে থাকতে পারি।

যা বিকারসমূহ থেকে মুক্ত থাকার উপায় শিক্ষা দেয়, তাহাই জীবন যাপনের যথার্থ উপায়, তাহাই শুদ্ধ ধর্ম। শুদ্ধ ধর্মের স্বরূপ বড়ই মঙ্গলময় এবং কল্যাণপ্রদ। আমরা যখন বিকার-বিমুক্ত হয়ে নির্মল চিত্তে আচরণ করি, তখন নিজে তো বাস্তবিক সুখ-শান্তি ভোগ করেই থাকি, অন্যদেরও সুখ-শান্তির কারণ হই। আবার যখন বিকারগ্রস্ত হয়ে মলিন চিত্তে আচরণ করি তখন নিজে তো সন্তপ্ত হয়েই থাকি, অন্যদেরও সন্তাপের কারণ হয়ে থাকি। সমাজের শান্তিভঙ্গ করে থাকি।

ক্রোধ, লোভ, বাসনা, ভয়, মাৎসর্য, ঈর্ষা, অহংকার প্রভৃতি মনোবিকারের শিকার হয়ে আমরা হত্যা, চুরি, ব্যভিচার, মিথ্যা, ছল, কপটতা, চুক্‌লি, পরনিন্দা, নিরর্থক প্রলাপ বকা, রুক্ষ, কর্কশ কথাবার্তা বলা ইত্যাদি কুকর্ম করে থাকি। আর যখন ঐরূপ আচরণ করি, তখন নিজের এবং পরের সন্তাপের কারণ হয়ে থাকি। মনোবিকার ছাড়া কোনও শারীরিক বা বাচনিক দুষ্কর্ম সম্পন্ন হতে পারে না। তবে এটা অনিবার্য নয় যে, মনোবিকার উৎপন্ন হলেই আমাদের কায়িক বা বাচনিক দুষ্কর্ম করতেই হবে। অনেক সময় প্রবল মনোবিকার উৎপন্ন হলেও আত্মদমনের দ্বারা আমরা ঐ সব কায়িক এবং বাচনিক দুষ্কর্ম থেকে রক্ষা পেতে পারি। এবং এর দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে অন্যদেরও ক্ষতি করা থেকে মুক্ত থাকি। কিন্তু আবার দূষিত মনোবিকারের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে যদি মন ব্যাকুল হয়ে থাকে তাহলে মানসিক দুষ্কর্ম তো সাধিত হবেই। এর দ্বারা নিজেরও শান্তি নষ্ট হবে এবং পরোক্ষভাবে অন্যদেরও শান্তি ভঙ্গ করা হবে। আমাদের মনের দূষিত তরঙ্গগুলো আশেপাশের বাতাবরণকে প্রভাবিত এবং দূষিত না করে থাকতে পারে না।

আমাদের মন যখন বিকার-বিমুক্ত এবং নির্মল থাকে তখন স্বাভাবিকভাবেই তা স্নেহ এবং সদ্ভাব, মৈত্রী এবং করুণায় পূর্ণ হয়ে ওঠে। সেই সময় আমরা নিজে সুখ-শান্তি তো অনুভব করেই থাকি, পরোক্ষ ভাবে অন্যদেরও সুখ-শান্তির কারণ হই। আমাদের নির্মল চিত্তের তরঙ্গগুলো আশেপাশের বাতাবরণকেও প্রভাবিত করে এবং তাকে যতটা সম্ভব নির্মল করে তোলে।

কিন্তু আত্মদমনই কেবল ধর্মের সর্বাঙ্গ সম্পূর্ণতা নয়। তবে ধর্ম ধারণ করার প্রথম পদক্ষেপ এখান থেকেই আরম্ভ হয়। প্রথমে তো সংযম-সংবর দ্বারা আমাদের কায়িক এবং বাচনিক দুষ্কর্ম থেকে বিরত হতে হবে এবং তারপর সতত অভ্যাস দ্বারা মানসিক দুষ্কর্ম থেকে বিরত হতে হবে। মানসিক দুষ্কর্ম থেকে বিরত হওয়া মানে মানসিক বিকারসমূহ থেকে মুক্ত হয়ে যাওয়া। বিকার-বিহীন নির্মল চিত্ত নিজের সহজ স্বভাবের দ্বারাই কোন মানসিক, বাচিক বা শারীরিক দুষ্কর্ম সম্পাদন করতে পারবে না। অতএব, আসল কথা হল—নিজের চিত্তকে বিকার থেকে বিমুক্ত রাখা।

আমরা নিজেদের প্রত্যেক কর্মের প্রতি সজাগ থেকেই তাকে দোষমুক্ত রাখতে পারি। নিজের চিত্ত এবং চিত্তের বিকারের প্রতি সজাগ থেকেই তাকে আমরা বিকার-মুক্ত রাখতে পারি। তার প্রতি আমরা যদি অচেতন ও অজ্ঞান থাকি তাহলে আমরা কখনও তাকে নির্মল করতে পারবো না এবং তার নির্মলতাকে রক্ষাও করতে পারবো না। অতএব নিজের শারীরিক, বাচিক এবং মানসিক কর্মসমূহকে এবং নিজের চিত্ত ও চিত্তবৃত্তিকে সতত নিরীক্ষণ করতে থাকার অভ্যাসই ধর্ম ধারণ করার যথার্থ অভ্যাস। কোনও কর্ম সম্পাদন করার পূর্বে এবং করার সময়ে এটা বিচার করতে হবে যে এই কর্মের দ্বারা আমার বা অন্যদের মঙ্গল হবে, না অমঙ্গল। যদি মঙ্গল হয় তাহলে সেই কাজ করুন, অমঙ্গল হলে তা করা থেকে বিরত থাকুন। এইভাবে বিবেক দ্বারা কর্ম সম্পাদিত হলে তা মঙ্গলময়ই হবে। অতএব তা ধর্মময়ও হবে। যদি কখনও অসাবধানতাবশতঃ বিবেচনা না করে নিজের বা অন্যের পক্ষে অহিতকর

কোন কায়িক বা বাচিক দুষ্কর্ম সম্পাদিত হয়ে যায় তখন তা নিয়ে অনুতপ্ত হয়ে নতুন অপরাধগ্রন্থি না বেঁধে যথাশীঘ্র সম্ভব নিজের কোন বন্ধু সাধক অথবা গুরুজনের সঙ্গে মিলিত হয়ে তাঁর কাছে নিজের ভুল স্বীকার করে ভারমুক্ত হওয়া উচিত এবং ভবিষ্যতে আরও বেশী সাবধান থাকার জন্য কৃতসঙ্কল্প হওয়া উচিত। চিত্তের প্রতিও এইরূপ সজাগ থাকার অভ্যাস বাড়াতে হবে। যখনই চিত্তে কোন বিকার উৎপন্ন হবে তখনই তাকে নিরীক্ষণ করতে হবে। সাক্ষীর ন্যায় নিরীক্ষণ করতে থাকলেই তা দুর্বল হয়ে বিনষ্ট হয়ে যাবে। কখনও অসাবধানতাবশতঃ যদি তাকে নিরীক্ষণ করা সম্ভব না হয় এবং পরিণামে তা নিজের উপর অধিকার বিস্তার করে, তবুও তাকে ভেবে ভেবে ভেঙে পড়া অনুচিত। বরং আরও বেশী সাবধান থাকার জন্য কৃতসঙ্কল্প হবেন এবং সজাগ থাকার অভ্যাস বাড়াবেন। শুদ্ধ ধর্মে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার এটাই বৈজ্ঞানিক প্রণালী।

যে অভ্যাসের দ্বারা নিজের কর্মসমূহের প্রতি সজাগতা এবং সাবধানতা গড়ে ওঠে তাই শুদ্ধ ধর্মের অভ্যাস। যে বিধির দ্বারা নিজের কর্ম-শোধনকারী চিত্তবিশুদ্ধি আসে, তা'ই ধর্মবিধি।

যখন আমরা আত্ম-নিরীক্ষণ করে অনুভূতি দ্বারা বিবেচনা করি তখন দেখতে পাই যে প্রত্যেক দুষ্কর্মের কারণ হচ্ছে নিজের চিত্তের মালিন্য, কোন না কোন মনোবিকার। আমরা এটাও দেখতে পাই যে, প্রত্যেক বিকারের কারণ নিজেরই অহং'এর প্রতি উৎপন্ন গভীর আসক্তি। যখন আসক্তির অন্ধকারে এই 'অহং'কে অত্যধিক গুরুত্ব দিয়ে তারই বশীভূত হয়ে পড়ি, তখনই সঙ্কুচিত মানসিক অবস্থায় আবদ্ধ হয়ে মনকে মলিন করে এমন কোন কর্ম করে ফেলি, যা পরিণামে অকুশল।

আত্মনিরীক্ষণের অভ্যাসের দ্বারা নিজের অনুভূতিবলে এটা স্পষ্ট হয় যে যখন স্বার্থান্ধ হয়ে আমরা বিকারগ্রস্ত হই তখন অন্যদের অনিষ্ট তো করিই, নিজের প্রকৃত স্বার্থও বিঘ্নিত করি। আর এই অন্ধত্ব থেকে মুক্ত থাকতে পারলে আত্মহিত এবং পরহিত উভয়ই সাধন করতে পারি।

আত্মহিত এবং পরহিত সাধন করার কর্মই ধর্ম। যাতে নিজের উপকারের সঙ্গে পরেরও উপকার সাধিত হয় তাই ধর্ম। যার দ্বারা কারও অনিষ্ট হয়, তা অধর্মই। আত্মোদয় এবং সর্বোদয়ের সামঞ্জস্যপূর্ণ সুস্থ জীবনই ধর্ম। আত্মোদয় এবং সর্বোদয় একে অন্যের উপর আশ্রিত।

আমাদের সৎকর্ম এবং দুষ্কর্ম কেবল আমাদেরই সুখী বা দুঃখী করে না, বরং আমাদের সঙ্গীসাথীদেরও তা প্রভাবিত করে। মানুষ সমাজের অন্য সদস্যদের সঙ্গে বাস করে, সে সমাজেরই একটি অবিভাজ্য অঙ্গ। মানুষ সমাজের দ্বারা নিজে প্রভাবিত হয় এবং সমাজকেও সে কমবেশী প্রভাবিত করে থাকে। এইজন্য ধর্ম সাধন দ্বারা যখন আমরা নৈতিক জীবন যাপন করি, দুষ্কর্ম থেকে মুক্ত থেকে সৎকর্ম সম্পাদনে রত হই, তখন কেবল নিজেরই যে ভাল হয় তা নয়, অন্যদেরও ভাল হয়।

নৈতিক জীবন লাভ করার জন্যই তো ধর্মসাধন। যদি ধর্মের অভ্যাসের দ্বারা নীতিবোধ উন্নত না হয়, আমাদের লৌকিক ব্যবহার যদি শুদ্ধ না হয়, আমরা নিজের জন্য এবং অন্যদের জন্য মঙ্গলময় জীবন যদি যাপন করতে না পারি তা'হলে সেই ধর্ম আমাদের কোন্ কাজে লাগবে? কারও কোন কাজে লাগবে কি? ধর্ম এই জন্যই আছে যে, যেন আমাদের পরস্পরের সম্বন্ধ ভালো হয়, যেন আমাদের মধ্যে ব্যবহার-কুশলতা আসে। পরিবার, সমাজ, জাতি, রাষ্ট্র এবং অন্তঃরাষ্ট্রিয় সমস্ত পারস্পরিক সম্বন্ধ ব্যক্তি-ব্যক্তির সম্বন্ধের উপরই নির্ভর করে। অতএব শুদ্ধ ধর্ম হচ্ছে প্রত্যেক ব্যক্তি এখানেই, এই জীবনেই অন্যদের প্রতি নিজের ব্যবহার উন্নত করবে। এই জীবনেই সুখ-শান্তিতে বাঁচার জন্যই ধর্ম। মৃত্যুর পরে মেঘের ওপর কোন অজ্ঞাত স্বর্গের জীবন যাপনের জন্য নয়। মৃত্যুর পরে পৃথিবীর নীচে কোন অজ্ঞাত নরক থেকে বাঁচার জন্যও নয়। ধর্ম হচ্ছে আমাদের নিজেদের অভ্যন্তরে সমাহিত স্বর্গের সুখ ভোগ করার জন্য, আমাদের নিজেদের অভ্যন্তরে সময়ে সময়ে যে নারকীয় অগ্নি জ্বলে ওঠে তাকে শান্ত করার জন্য এবং তার থেকে বাঁচার জন্য। ধর্ম হচ্ছে **সাংদৃষ্টিক** এবং প্রত্যক্ষ। এই জীবন এবং এই জগতেরই জন্য। বর্তমানেরই জন্য। যিনি নিজের

বর্তমানকে শুধরে নিয়েছেন তাঁর ভবিষ্যতের চিন্তা করার প্রয়োজন নেই। তাঁর ভবিষ্যত আপনা থেকেই শুধরে যায়। যিনি ইহলোককে শুধরে নিয়েছেন, তাঁর পরলোকের চিন্তা নেই। তাঁর পরলোক আপনা থেকেই শুধরে যায়। যিনি নিজের বর্তমানকে শুধরে নিতে পারেন নি, নিজের ইহলোককে শুধরে নিতে পারেন নি, এবং কেবল ভবিষ্যতের আশায় থাকেন, পরলোকের প্রতি উন্মুখ হয়ে বসে থাকেন, তিনি নিজেই নিজেকে প্রবঞ্চিত করেন, নিজের বাস্তবিক মঙ্গল থেকে বঞ্চিত হন, এবং শুদ্ধ ধর্ম থেকে দূরে থাকেন। ধর্ম হচ্ছে **অকালিক** অর্থাৎ এই জীবনেই ফলপ্রদায়ী। ধর্মের নামে কোন অনুষ্ঠান করে যদি এখানে তার ফল পাওয়া না যায়, বিকার-বিহীন চিত্তবিশুদ্ধির প্রকৃত সুখ এখানে এই জীবনে যদি পাওয়া না যায়, তাহলে বুঝতে হবে আপনি কোন প্রবঞ্চনাতে জড়িয়ে পড়েছেন। শুদ্ধ-ধর্ম থেকে বঞ্চিত হয়ে আছেন। ধর্ম সকলের জন্য এই জীবনকে সুখ শান্তিময় করবার কারণ এবং পরোক্ষ কোন সুদূর ভবিষ্যতের চিন্তা থেকে মুক্ত রাখার কারণ—এটাই ধর্ম। এটাই ধর্মের শুদ্ধতা। ইহাই শুদ্ধধর্মের জীবন। যার আবশ্যকতা সর্বজনীন।

ধর্ম সর্বজনীন, এইজন্য শুদ্ধ-ধর্মের সঙ্গে সম্প্রদায়ের কোন সম্বন্ধ নেই, কোন লেন দেন নেই। শুদ্ধ-ধর্মপথের পথিক যখন ধর্ম পালন করেন তখন কোন সম্প্রদায় বিশেষের নিষ্প্রাণ রীতি-নীতি পূর্ণ করার জন্য নয়, কোন গ্রন্থ বিশেষের বিধিবিধানের অনুষ্ঠান পূর্ণ করার জন্য নয়, মিথ্যা অন্ধবিশ্বাসজাত সংস্কার পরম্পরার শিকার হয়ে কোন বদ্ধজীবনের অনুগামী হবার জন্য নয়—বরং শুদ্ধ ধর্মের অনুশীলনকারী নিজের জীবনকে সুখী এবং সুস্থ করার জন্যই ধর্মের পালন করেন। ধার্মিক জীবন যাপনের জন্য ধর্মকে ভাল করে বুঝে তাকে আত্মকল্যাণ এবং পরকল্যাণের কারণ জেনেই তাকে পালন করেন। না বুঝে কেবল অন্ধবিশ্বাসহেতু অথবা কোন অজ্ঞাত শক্তিকে সন্তুষ্ট এবং প্রসন্ন করার জন্য অথবা তার ভয়ে আশংকিত-আতংকিত হয়ে ধর্মের পালন করেন না। ধর্মের পালন কলুষ সমূহের দমন করার জন্যই নয়, বরং প্রজ্ঞাপূর্বক সেগুলোর পূর্ণ প্রশমন

এবং ত্যাগ করার জন্য। ধর্মের পালন কেবল নিজের জন্য নয়, বরং বহু জনের হিতসুখ, মঙ্গল-কল্যাণ এবং বহু জনের স্বস্তি-মুক্তির জন্যও বটে।

ধর্মের পালন এটা বুঝেই করা উচিত যে ধর্ম সর্বজনীন, সর্বজনহিতকারী। কোন সম্প্রদায়বিশেষ, বর্ণবিশেষ বা জাতিবিশেষের দ্বারা ধর্ম আবদ্ধ নয়। যদি ঐরূপ হয়, তাহলে ধর্মের শুদ্ধতা নষ্ট হয়ে যায়। ধর্ম ততক্ষণই শুদ্ধ যতক্ষণ সেটা সর্বজনীন, সার্বদেশিক এবং সার্বকালিক থাকে। ধর্ম সকলেরই জন্য একইভাবে কল্যাণকারী, মঙ্গলকারী এবং হিতসুখকারী। সকলের দ্বারা সহজভাবে বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করার যোগ্য।

বিশুদ্ধ বায়ুমণ্ডলে থাকা, বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করা, শরীর পরিচ্ছন্ন রাখা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন কাপড় পরা, শুদ্ধ সাত্ত্বিক ভোজন আমাদের এইজন্যেই করা উচিত যে এগুলো আমাদের পক্ষে হিতকর। কিন্তু এগুলি কেবল নিজের জন্যই নয়, কোন জাতিবিশেষ, বর্ণবিশেষ বা সম্প্রদায়বিশেষের জন্যই নয়, বরং সকলের জন্যই সমানভাবে হিতকর। কেবল আমি নই, যে কোন ব্যক্তি যদি অশুদ্ধ, অস্বাস্থ্যকর বাতাবরণে থাকে, দুর্গন্ধ বিষাক্ত বায়ু সেবন করে, নিজের শরীর এবং বস্ত্র অপরিচ্ছন্ন রাখে, অপরিষ্কার এবং দূষিত দ্রব্য ভোজন করে তাহলে তার স্বাস্থ্যহানি হবে, সে রোগী হবে, দুঃখী হবে। এই নিয়ম সর্বজনীন। কোন এক ব্যক্তিবিশেষ বা কোন এক জাতিবিশেষের জন্য ঐ নিয়ম নয়। ঠিক একইভাবে যখন কেউ নিজের মনকে বিকার দ্বারা বিকৃত করে সে তখন ব্যাকুল হয়ে যায়। তার বাত-পিত্ত-কফে বিষমতা উৎপন্ন হয়, সে রোগগ্রস্ত হয়। স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের সাধারণ নিয়ম সকলেরই শরীর এবং মনের উপর সমানভাবে প্রযোজ্য। প্রকৃতি এটা দেখে না যে এই নিয়মের লঙ্ঘনকারী ব্যক্তিটি কে, কোন জাতির বা কোন সম্প্রদায়ের? প্রকৃতি কোন সম্প্রদায় বিশেষের ব্যক্তির উপর কৃপা করে না বা অন্য কারও উপর কোপ করে না। ম্যালেরিয়া ম্যালেরিয়াই। হিন্দু বা বৌদ্ধ নয়, জৈন বা পার্শী নয়, মুসলমান বা খৃষ্টান নয়। ঠিক সেই রকম কুইনাইন

কুইনাইনই। তাও হিন্দু নয়, বৌদ্ধ নয়, জৈন বা পার্শী নয়, মুসলমান বা খৃষ্টান নয়। এইভাবে ক্রোধ, ঈর্ষা, দ্বেষ প্রভৃতি বিকারও হিন্দু নয়, বৌদ্ধ নয়, জৈন বা পার্শী নয়, মুসলমান বা খৃষ্টান নয়। অনুরূপ ভাবে ওগুলো থেকে বিমুক্ত থাকাও হিন্দু নয়, বৌদ্ধ নয়, জৈন বা পার্শী নয়, মুসলমান বা খৃষ্টান নয়। বিকার থেকে বিমুক্ত থাকাই শুদ্ধ ধর্ম—ইহা না হিন্দু, না বৌদ্ধ, না জৈন, না পার্শী, না মুসলমান, না খৃষ্টান। তা কেবল শুদ্ধ ধর্মই।

ধর্ম হচ্ছে সকলের জন্য এক আদর্শ জীবনশৈলী, সুখে থাকার পবিত্র পদ্ধতি, শান্তি লাভ করার বিমল বিধান, সর্বজনকল্যাণপ্রদ আচার-সংহিতা।

শীলবান, সমাধিবান, প্রজ্ঞাবান হওয়া কি কেবল বৌদ্ধদেরই ধর্ম? অন্য কারও নয়? বীতরাগ, বীতদ্বেষ, বীতমোহ হওয়া কি কেবল জৈনদেরই ধর্ম? অন্য কারও নয়? স্থিতপ্রজ্ঞ, অনাসক্ত, জীবনমুক্ত হওয়া কি কেবল হিন্দুদেরই ধর্ম? অন্য কারও নয়? প্রেম এবং করুণার দ্বারা ওতপ্রোত হয়ে জনসেবা করা কি কেবল খৃষ্টানদেরই ধর্ম? অন্য কারও নয়? জাতপাতের ভেদাভেদ থেকে মুক্ত হয়ে সামাজিক সমতার জীবন যাপন করা কি কেবল মুসলমানদের ধর্ম? অন্য কারও নয়?—ধর্মপালনের মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে 'আমি মানুষ হব। ভাল মানুষ হব।' ভাল মানুষ হতে পারলেই তো ভাল হিন্দু, ভাল বৌদ্ধ, ভাল জৈন, ভাল মুসলমান, ভাল খৃষ্টান ইত্যাদি হয়েই যাব। যদি ভাল মানুষই হতে পারা না যায়, তাহলে বৌদ্ধ হয়ে থাকলে কি হবে? হিন্দু, জৈন, খৃষ্টান, মুসলমান হয়ে থাকলেই বা কি হবে?

ধর্মের এই শুদ্ধতাকে উপলব্ধি করুন এবং ধারণ করুন। আমাদের সকলের জীবনে শুদ্ধ ধর্ম জাগ্রত হোক। সারবিহীন খোলসের অসারত্ব বোধ হোক, উন্মূলন হোক। শুদ্ধ সারবস্তুর যথার্থ মূল্যায়ন হোক, প্রতিষ্ঠা হোক। শুদ্ধ ধর্ম জীবনের অঙ্গ হয়ে থাক, এতেই আমাদের প্রকৃত কল্যাণ, প্রকৃত মঙ্গল নিহিত আছে।

সত্য ধর্ম হ্যয় সোয়

ধর্ম ন হিন্দু বৌদ্ধ হ্যয়, ধর্ম ন মুসলিম জৈন।
ধর্ম চিত্ত কী শুদ্ধতা, ধর্ম শান্তি সুখ চৈন।।

ধর্ম ধর্ম তো সব কহেঁ, পর সমঝে না কোয়।
শুদ্ধ চিত্ত কা আচরণ, সত্য ধর্ম হ্যয় সোয়।।

কুদরত কা কানুন হ্যয়, সব পর লাগু হোয়।
বিকৃত মন ব্যাকুল রহে, নির্মল সুখিয়া হোয়।।

দ্বেষ ঔর দুর্ভাব কে, জব জব উঠে বিকার।
ম্যয় ভী দুখিয়া হো উঠুঁ, দুখী করুঁ সংসার।।

ম্যয় ভী ব্যাকুল না রহুঁ, জগত ন ব্যাকুল হোয়।
জীবন জীনে কী কলা, সত্য ধর্ম হ্যয় সোয়।।

য়েহী ধর্ম কী পরখ হ্যয়, য়েহী ধর্ম কা মাপ।
জন জন কা মঙ্গল করে, দূর করে সন্তাপ।।

২
শুদ্ধ ধর্ম

দীর্ঘ পরম্পরার ফলে বর্তমানে ধর্মের নামে যে নিঃসার খোলস অবশিষ্ট আছে তা থেকে মুক্তি নিয়ে শুদ্ধ ধর্মের সার গ্রহণ করুন। ধর্মের সারই মঙ্গলদায়ক এবং সার্থক। কিন্তু খোলস নিরর্থক এবং হানিকর। সার প্রাপ্ত হলেই সত্যিকার সুখ পাওয়া যায়।

শুদ্ধ ধর্মের সার হচ্ছে **শীল,** সদাচার। কায়িক এবং বাচিক দুষ্কর্ম থেকে বাঁচতে হবে। কায়িক এবং বাচিক দুষ্কর্মে লেগে থাকলে মনের গ্লানি এবং বিকার বাড়বেই। কারণ সকল কায়িক এবং বাচিক দুষ্কর্ম কলুষিত মনের দ্বারাই সম্পন্ন হয়। চিত্ত দূষিত না হলে হিংসা, চুরি, ব্যভিচার, অসত্য অথবা নোংরা ভাষণ, অথবা নেশাদ্রব্য সেবন সংঘটিত হতে পারে না। কায় এবং বাক্-এর দুষ্কর্মের দ্বারা মনের মালিন্য বেড়েই যায়, কমে না। মনের সমস্ত প্রকার মালিন্য আমাদের দুঃখীই করে, সুখী করে না।

শুদ্ধ ধর্মের সার হচ্ছে **সমাধি**। কোন কল্পনা বিহীন সত্য অবলম্বনের সাহায্যে চিত্তকে একাগ্র করার নামই সমাধি। যেমন একাগ্রতা বিহীন চিত্ত মলিন থাকে, সেই রকম কল্পনা বা কামনার আধারে একাগ্র হওয়া চিত্তও মলিন। মলিন চিত্ত আমাদের দুঃখই দেয়, সুখ দেয় না।

শুদ্ধ ধর্মের সার হচ্ছে **প্রজ্ঞা।** দৈনন্দিন জীবনের সমস্ত বাহ্য অবলম্বন এবং নিজের মনোস্থিতি ঠিক যেমন আছে সেই ভাবেই, ও তাদের মূল প্রকৃতিকে জানতে থাকা—এবং তাদের প্রতি একাত্মতা স্থাপন না করে

অনাসক্ত থাকাই প্রজ্ঞা। 'রাগ', দ্বেষ, মোহ এবং তার কারণে উৎপন্ন আসক্তিই মনের মালিন্য। প্রজ্ঞা এই আসক্তিজাত মালিন্য দূর করে। মালিন্য থাকলে আমরা দুঃখীই থাকি, সুখী হতে পারি না।

শীল, সমাধি এবং প্রজ্ঞার অভ্যাসের প্রত্যেক পদক্ষেপ হচ্ছে শুদ্ধ ধর্মের অভ্যাসের পদক্ষেপ, ধর্মের সার গ্রহণ করার পদক্ষেপ, সত্যিকার সুখ লাভ করার পদক্ষেপ। যার দ্বারা আমাদের শীল প্রতিষ্ঠিত হয় না, শুদ্ধ সমাধি পুষ্ট হয় না এবং প্রজ্ঞা স্থির হয় না—সেই কর্মকে (নিঃসার পরম্পরা হেতু) যতই ধার্মিক কৃত্য বলা যাক না কেন, বস্তুতঃ তা সত্য ধর্ম থেকে, সার তত্ত্ব থেকে দূরে নিয়ে যাওয়ারই পদক্ষেপ। এইরূপ সকল নিরর্থক বাহ্যাচার, মিথ্যা কর্মকাণ্ড, নিষ্প্রাণ সংস্কার, দম্ভপূর্ণ বাহ্যিক প্রদর্শন, আড়ম্বরপূর্ণ বেশভূষা, উচ্চ জাতিতে জন্ম নেওয়া অথবা ধনবান হওয়ার মিথ্যা অহংকার ইত্যাদি সবই কেবল নিঃসার। কেবল দুঃখ এবং দুঃখ, নিজের জন্যও, অন্যের জন্যও।

সেজন্য, ধর্মের সারকেই গ্রহণ করুন, যা নিঃসার তা ত্যাগ করুন। নিজের এবং অন্যের সুখের জন্য, কল্যাণের জন্য।

শীল ধর্ম কী নীঁও হ্যয়

শীল ধর্ম পালন ভলা, সম্যক ভলী সমাধি।
প্রজ্ঞা তো জাগ্রত ভলী, দূর করে ভব ব্যাধি।।

শীল ধর্ম কী নীঁও হ্যয়, হ্যয় সমাধি হী ভিঁত।
প্রজ্ঞা ছত হ্যয় ধর্ম কী, মঙ্গল ভবন পূনীত।।

প্রজ্ঞা শীল সমাধি হী, শুদ্ধ ধর্ম কা সার।
কায়া বাণী চিত্ত কে, সুধরে সব ব্যবহার।।

শুদ্ধ ধর্ম কা শান্তিপথ, সম্প্রদায় সে দূর।
শুদ্ধ ধর্ম কী সাধনা, মঙ্গল সে ভরপূর।।

জো চাহে সুখিয়া রহে, রহেঁ সভী খুশহাল।
মনসে তনসে বচনসে, শুদ্ধ ধর্ম হী পাল।।

য়েহ হী ঋত হ্যয়, নিয়ম হ্যয়, ইসসে বচা না কোয়।
ধর্ম ধার সুখ হী মিলে, ত্যাগে দুখিয়া হোয়।।

৩
ধর্মের সার

ধর্ম ঠিকভাবে বোঝা গেলেই তাকে ঠিকভাবে পালন করা যায়। ধর্মের সারকে বোঝার চেষ্টা করুন। সারকে বুঝতে পারলে তবেই গ্রহণ করতে পারবেন, অন্যথায় ভিতরের সার বস্তুকে বাদ দিয়ে কেবল খোলসটাকে নিয়ে পড়ে থাকতে হবে। তাকেই সার মনে করে, ধর্ম বলে মানতে শুরু করবেন।

সার বস্তুতে সর্বদা সমানত্ব থাকে। খোলসই ভিন্ন ভিন্ন হয় এবং যেখানে এই খোলসগুলোকেই ধর্ম বলে মনে করা হয় সেখানেই ধর্ম ভিন্ন ভিন্ন হয়ে যায়। এটা হিন্দুদের ধর্ম—হিন্দুদের মধ্যেই আবার সনাতনী, আর্য সমাজী। এটা বৌদ্ধদের ধর্ম—বৌদ্ধদের মধ্যেই আবার মহাযানী, হীনযানী। এটা জৈনদের ধর্ম—জৈনদের মধ্যেই আবার দিগম্বরী, শ্বেতাম্বরী। এটা খৃষ্টানদের ধর্ম—খৃষ্টানদের মধ্যেই আবার ক্যাথলিক এবং প্রোটেষ্টেণ্ট। এটা মুসলমানদের ধর্ম—মুসলমানদের মধ্যেই আবার শিয়া, সুন্নী প্রভৃতি কেবল ভিন্ন ভিন্নই নয়, পরস্পর বিরোধীও। নিঃসার খোলসগুলোকে গুরুত্ব দেবার কারণেই এইসব বিভিন্নতা এবং এদের নিয়েই পারস্পরিক বিরোধ উৎপন্ন হয়।

কেউ রাখে টিকি, কেউ বা রাখে দাড়ি। টিকি মোটা না পাতলা? দাড়ি পাকানো গোঁফওয়ালা, নাকি সাধারণ গোঁফ? কেউ রাখে মাথায় লম্বা চুল—চুল বেশ পরিপাটি করে সাজানো; কারও বা রুক্ষ-শুকনো চুল জটা-জটিল, কেউ মাথা নেড়া করে—তাও বা কেউ ক্ষুর দিয়ে, কেউ বা চিমটা দিয়ে? কেউ বা কান ফুটো করে—তাতে পরে কুণ্ডল বা মুদ্রা? কেউ বা লাগায় তিলক — কেউ বা চন্দনের, কেউ বা সিন্দুরের, কেউ বা ছাইয়ের? কেউ এই রকমের, কেউ বা অন্য রকমের? কেউ বা পরে

মালা—রুদ্রাক্ষের, বা চন্দনের বা তুলসীর? মাঝখানে লকেট যুক্ত না লকেট বিহীন? যদি লকেট থাকে, তাহলে তাতে কোন দেবী, দেবতা, গুরু বা আচার্যের চিত্র বা চিহ্ন থাকবে? কেউ বা সবস্ত্র। কেউ বা নির্বস্ত্র? কাপড় পড়লে সেলাই করা, না সেলাই না করা? এই রঙের না ঐ রঙের, এই রকম ঢঙের না ওই রকম ঢঙের? ধুতি না লুঙ্গী? পাজামা না পাতলুন? কামিজ না কুর্তা? চাপকান না কোট? দুপল্লী টুপি, না তুর্কী বা ইংরেজী টুপি? কেউ বা গলায় বা বাহুতে বা কবজিতে বা পায়ে বা হাতের আঙুলে সুতো বাঁধে, কেউ বা যন্ত্র, তাবিজ বা কবচ? তাতে সংখ্যা থাকবে, না অক্ষর? না শব্দ? না মন্ত্র? না তন্ত্র? না যন্ত্র? কেউ বা হাতে নেয় পাত্র, কেউ বা করপাত্রী? পাত্র নিলে সেটা কি মাটীর? কাঠের? লোহার? না অন্য কোন ধাতুর?

এই যে ভিন্ন ভিন্ন রূপ, ভিন্ন ভিন্ন বাহ্যাড়ম্বর, বেশভূষা, আকার-প্রকার সাজ-সজ্জা,—এগুলো ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রতীকমাত্র নয়, বরং এরা ভিন্ন ভিন্ন ধর্মের নাম নিয়ে পারস্পরিক বিরোধের কারণে পরিণত হয়েছে। কবে কোন এক ধর্মনেতা তৃষ্ণার্ত জনতাকে অমৃতরূপ ধর্মরস প্রদান করেছিলেন। কিন্তু যে পাত্রে দিয়েছিলেন সেই পাত্রই আমাদের কাছে প্রমুখ বা প্রধান হয়ে দাঁড়িয়েছে। কালান্তরে সেই পাত্র জীর্ণ হয়ে তা থেকে সমস্ত ধর্মরস বেরিয়ে গেল। শূণ্য পাত্রটাই শুধু আমাদের কাছে রয়ে গেল। এই পাত্রের ধর্মরসকে আমরা কখনও জানলাম না, স্বাদও গ্রহণ করলাম না। এইভাবে এই সার বিহীন পাত্রটাই আমাদের কাছে ধর্মের রূপ নিয়েছে, এবং তাকেই বুকের মধ্যে আঁকড়ে ধরে আমরা জীবনের সার্থকতা মনে করছি।

যেমন ভিন্ন ভিন্ন রূপসজ্জা তেমনি ভিন্ন ভিন্ন নিঃসার, নির্জীব, নিষ্প্রাণ কর্মকাণ্ড আমাদের কাছে ধর্ম হয়ে গেছে এবং সেটার সাথে আমরা গভীর আসক্তিতে আবদ্ধ হয়ে গেছি। শুদ্ধ ধর্ম অন্তর্হিত হয়েছে—আর আমরা চুল্লী চৌকীকে, কাঁচা বা পাকা রান্নাকে, জাত পাতকে, ছুঁয়া-ছুঁৎকে, এই বা ঐ নদী, পুকুর বা সমুদ্রে স্নানকে, এই বা সেই তীর্থে যাত্রা করাকেই ধর্ম বলে মানতে শুরু করেছি। এই বা সেই মন্দির

মসজিদ গীর্জা চৈত্য উপাশ্রয় বা গুরুদ্বারে সকাল-সন্ধ্যা হাজিরা দেওয়াকেই ধর্ম বলে মানতে সুরু করেছি। পূর্ব বা পশ্চিম দিকে মুখ করে, দাঁড়িয়ে বা বসে, হাঁটু ভেঙে বা পা ভাঁজ করে বসে হাত জোড় করে বা অঞ্জলি প্রসারিত করে, পঞ্চাঙ্গ, অষ্টাঙ্গ বা দণ্ডবৎ প্রণাম করে এই বা সেই দেবী দেবতা, গুরু, আচার্য বা ধর্মনেতার ছবি, মূর্তি, চরণচিহ্ন, পাদপীঠ বা ধাতু-অবশেষ অথবা তাঁর উপদেশ-গ্রন্থের সামনে বন্দনা করা, মাথা নত করা, দীপ জ্বালা, নৈবেদ্য দেওয়া, আরতি করা, শাঁখ বাজানো, ঘণ্টা বাজানো, নাচা, গাওয়া, আজান দেওয়া, স্তোত্র পাঠ করা, তাঁর নামে মালা জপ করা অথবা তাঁর বাণী পাঠ করাকেই ধর্ম বলে মানতে সুরু করেছি, যদিও তা যন্ত্রের মতো পালন করাই বা হোক না কেন। এই প্রকারে ভীত চিত্তে কারও মানত করা, প্রসাদ চড়ানো, জাত-জড়ুলা, যাদু-টোনা অথবা ঝাড়-ফুঁক করাকেই ধর্ম বলে মানছি। কোন অজ্ঞাত অদৃশ্য সত্তাকে সন্তুষ্ট ও প্রসন্ন করার জন্য মূর্গী, ছাগল, গরু, মোষ এমনকি মানুষ পর্যন্ত বলি দান দিয়ে থাকি — এবং এটাকেই ধর্ম বলে মানছি। কেউ বলি দেবার সময় এক কোপে ধড় আর মাথা আলাদা করাকে, কেউ বা আস্তে আস্তে যন্ত্রণা দিয়ে প্রাণীকে হত্যা করাকেই ধর্ম বলে মানে। এই সকল ভিন্ন ভিন্ন কর্মকাণ্ডযুক্ত ধর্ম বাজারে বিক্রি সুরু হয়েছে। আমরা ইচ্ছে করলে পয়সার জোরে এই ধর্মকে কিনে নিতে পারি। যে কর্মকাণ্ড স্বয়ং করা যায় না তাকে ভাড়া করা লোক দিয়ে করানো যায়। বাস্তবিক, এটা হচ্ছে সত্য-ধর্মের ঘোর অবমূল্যায়ন।

সত্যধর্মের উপলব্ধির জন্য আমরা যে সাধন পেয়েছি, আমাদের না বোঝার কারণে সেটাই আমাদের বন্ধন হয়ে গেছে। কোন মহাপুরুষ আমাদেরকে অন্ধকারে চলতে দেখে অত্যন্ত করুণা পূর্ণ চিত্তে একটা জ্বলন্ত মশাল আমাদের হাতে ধরিয়ে দিয়েছেন যাতে আমরা তার আলোকের সাহায্যে ঠিক রাস্তায় চলে নিজের জীবনযাত্রাকে কুশলতার সহিত পূর্ণ করতে পারি। কিন্তু কালান্তরে সেই মশালের জ্যোতি নিভে গেছে। আমাদের হাতে কেবল মশালের দণ্ডটাই ধরা আছে। আর আমরা মুঢ়তাবশতঃ দণ্ডটাকেই মশাল মনে করে তার প্রতি আসক্ত হয়ে গেছি।

শিব চলে গেছে শব পড়ে আছে। মিথ্যা বাহ্যাচারই আমাদের জন্য ধর্ম হয়ে গেছে। এরূপ দীন অবস্থায় আকণ্ঠ ডুবে যাওয়াতেই জনৈক প্রবাসী ভারতীয় বলছেন—

"আমি বার্মায় এসেছি চল্লিশ বছর। এখানে এসে আমি কত চুরি করেছি, ছল-কপটতা করেছি, ব্যভিচার করেছি, নেশা করেছি—কিন্তু নিজের ধর্মকে ছাড়িনি।"

"সেটা কিরকম ব্যাপার?"

জিজ্ঞেস করাতে অতি সহজভাবে তিনি বলছেন, "এই চল্লিশ বছর আমি কখনও কোন বর্মীর হাতে ছোঁয়া জল পান করিনি।" হায়, আমরা বেচারী ধর্মকে কি করুণ অবস্থায় এনে ফেলেছি!

কখনও কখনও এরূপ হয় যে, এই বাহ্যাচার এবং বাহ্যাড়ম্বররূপী স্থূল খোলসগুলোকে তো আমরা ধর্ম বলে মানছি না, বরং এইগুলোর জায়গায় এমন সূক্ষ্ম খোলসকে ধর্ম বলে মানতে সুরু করেছি যে সেগুলো অধিক ভ্রান্তিকর এবং বেশী কঠিন বন্ধনের কারণ হয়ে পড়েছে। যখন আমরা কোন অন্ধ মান্যতা, অন্ধ ভাবাবেশ অথবা বুদ্ধির স্তরের তর্ক-বিতর্ককে ধর্ম বলে মানতে সুরু করি, তখন তাতে অধিকতর বিভ্রান্ত হয়ে পড়ি। যে পরিবারে আমরা জন্মেছি, যে পরিবেশে পালিত হয়েছি, সেই বংশ পরম্পরার কোন মান্যতা সম্বন্ধে বারবার শুনতে থাকি। এইভাবে সেই মান্যতার ছাপ বারবার মনে পড়তে পড়তে এমন গভীর হয়ে যায় যে অন্য কোন সংস্কার যে ঠিক হ'তে পারে—তা স্বীকারই করতে পারি না। আমরা যে দার্শনিক পরম্পরাকে মেনে চলি, তার সঙ্গে আমাদের এক ভাবাত্মক সম্বন্ধ জুড়ে যায়। ফল স্বরূপ তার বিপরীত অন্য কোন দৃষ্টিকোণকে কখনও স্বীকার করতে পারি না। অথবা এটাও হয় যে, নিজের তর্কবুদ্ধির বলে আমরা যখন কোন বিশ্বাসকে স্বকীয় বলে গ্রহণ করে নিই, নিজের বুদ্ধিবলকে অত্যধিক প্রাধান্য দেওয়ার স্বভাববশতঃ অন্য কোন বিশ্বাসকে যথার্থ বলে মানতে পারি না। পরম্পরা-গত বিশ্বাস, হৃদয়গত ভাবুকতা অথবা বুদ্ধিস্তরের তর্কজালের কারণে যখন আমরা কোন বিশ্বাসের দাস হয়ে যাই তখন তার প্রতি এমন গভীর আসক্তি উৎপন্ন করে ফেলি যে চিরদিনের জন্য

তারই রঙের চশমা পরে ফেলি। তখন ঐ রঙের অতিরিক্ত অন্য কোন রঙ আমরা দেখতে পাই না। এইভাবে সত্য থেকে, শুদ্ধ ধর্ম থেকে আমরা অনেক দূরে সরে যাই। কারণ সকল কথাকেই নিজেরই চশমার রঙে দেখার অভ্যাস আমাদের হয়ে যায়।

ধরুন অন্ধবিশ্বাস, ভাবাবেশ অথবা বৌদ্ধিক চিন্তাধারার আধারে আমরা কোন সঠিক সিদ্ধান্তকে স্বীকার করে রেখেছি, এবং তার প্রতি জাত আসক্তির কারণে ঐ সিদ্ধান্তকে কেবল স্বীকার করার উপরই জোর দিয়ে থাকি। সেটার ব্যবহারিক দিকটাকে সর্বতোভাবে ভুলে যাই। কোন সিদ্ধান্তকে কেবল স্বীকার করে নিলে কি ফল পাওয়া যায়? মুখ্য কথা হচ্ছে, যদি সেই সিদ্ধান্ত যথার্থই হয় তাহলে জীবনে তার প্রয়োগ চাই। যেটা জীবনে প্রযুক্ত হয় সেটাই যথার্থ ধর্ম, অন্যথায় নিঃসার ভাবুকতা মাত্র, নিঃসার বুদ্ধিবিলাস মাত্র।

সিদ্ধান্তের স্তরে আমরা আত্মবাদী, না অনাত্মবাদী, ঈশ্বরবাদী না নিরীশ্বরবাদী, দ্বৈতবাদী না অদ্বৈতবাদী, এতগুলো তত্ত্বের সংখ্যা গণনাকারী না ততগুলো তত্ত্বের সংখ্যা গণনাকারী, এই তত্ত্বের এই এই ব্যাখ্যাকারী, না ঐ ঐ ব্যাখ্যাকারী—এতে কিই বা এসে যায়? আসল কথা হল, ব্যবহারিক জগতে আমরা শুদ্ধচিত্তের জীবন যাপন করছি কি না। নিজেকে যিনি ঈশ্বরবাদী বলে জাহির করেন, তাঁকেও দেখা যায় আগামী কালের চিন্তায় কত ব্যাকুল। যিনি নিজেকে অনাত্মবাদী বলেন, তাঁকেও দেখা যায় নিজের 'অহং' ভাবে কতটা ডুবে আছেন। অতএব, এই অবস্থাতে কেবলমাত্র সৈদ্ধান্তিক পক্ষ নিয়ে কী লাভ? মুখ্য কথা হচ্ছে ব্যবহারিক পক্ষের, আচরণের। শুদ্ধচিত্তের যে আচরণ, তাই ধর্ম। কোন বিশেষ বেশভূষা ধারণ করুন বা না করুন, কোন বিশেষ কর্মকাণ্ড সম্পন্ন করুন বা না করুন, কোন বিশেষ দার্শনিক বিচারকে মানুন বা না মানুন—সেটা আসল ব্যাপার নয়। যদি আমাদের মন দ্বেষ-দৌর্মনস্যতাতে পূর্ণ থাকে, তাহলে আমাদের ধর্মহীন বলেই জানতে হবে। আর যদি আমাদের মন, স্নেহ এবং সৌমনস্যতাতে* পূর্ণ থাকে, তাহলেই আমাদের

---

* মনের সুভাব।

ধার্মিক বলে জানতে হবে। কোন বেশভূষা, কোন কর্মকাণ্ড, কোন দার্শনিক মতবাদ যদি আমাদের চিত্তবিশুদ্ধির পক্ষে সহায়ক হয়, তাকে অবশ্যই গ্রহণ করবো, আর যদি আমাদের চিত্তশুদ্ধির সঙ্গে সেগুলোর কোন সম্বন্ধই না থাকে তাহলে সেগুলো নিরর্থক এবং নিঃসার। আবার সেগুলো যদি আমাদের ধার্মিক হওয়ার মিথ্যা ভ্রান্তি উৎপাদনকারী হয়ে থাকে, তাহলে তা বিষধর সাপের মতো ভয়ংকর। অতএব, সর্বদা তাকে পরিত্যাগ করতে হবে। যদি আমরা ধর্মের সার বুঝতে না পারি, তখন সেটা হবে নিজের মধ্যে ভয়ংকর বিষধর সাপ-বিছাকে পুষে রাখার মতোই। বিভিন্ন রকম আবর্জনাকে বুকে আঁকড়ে ধরে বলতে থাকি — এটাই আমার ধর্ম, এটাই অমূল্যরত্ন, এটাই মণি।

যতদিন পর্যন্ত ধর্মের বাস্তবিক সম্পদ লাভ না করা যায়, ততদিন আমরা দীন-দরিদ্র। আমাদের জীবন নিঃসার প্রদর্শনী, নিরর্থক কর্মকাণ্ড এবং নিষ্কর্মা বুদ্ধিবিলাসে পূর্ণ থাকে। কিন্তু তা হলেও যদি আমরা এই বাস্তব সত্যকে উপলব্ধি করতে পারি যে—এগুলো নিছক সারহীন খোলসমাত্র এবং ধর্মের সার চিত্তের শুদ্ধতার মধ্যে—আসক্তি, বিদ্বেষ, মোহের বন্ধন থেকে মুক্তিতে, বিষম স্থিতির মধ্যেও অর্থাৎ প্রতিকূল পরিবেশেও চিত্তের সমতা বজায় রাখার মধ্যে, মৈত্রী, করুণা, মুদিতার মধ্যেই নিহিত; শুধু তাই নয় যদি আমরা সঙ্গে সঙ্গে এটাও বুঝতে পারি যে এ সকল গুণ আমাদের মধ্যে নেই—তবে দেরীতে হলেও ধর্মের সার আমরা একদিন লাভ করতে পারবো। কিন্তু যদি আমরা ঐসব নিঃসার খোলসগুলোকেই ধর্ম বলে মানতে সুরু করি তাহলে শুদ্ধ ধর্মকে লাভ করার সমস্ত সম্ভাবনারই পরিসমাপ্তি ঘটবে। আমরা বাইরের খোলসগুলোতেই মগ্ন হয়ে কখনও ভিতরের দিকে দৃষ্টিপাত করিনা, আত্মনিরীক্ষণ করি না। এটা আমরা কখনও পরীক্ষা করে দেখি না যে, যে ধর্মকে আমরা পালন করছি তার মাধ্যমে মন-মানসে কি সংশোধন হচ্ছে, আমাদের জীবন-ব্যবহারে কি উন্নতি হচ্ছে? জন্ম-মৃত্যু থেকে মুক্তির জন্য হাজার রকম চর্চা করবো, হাজার আশা বাঁধবো, কিন্তু বর্তমান জীবনে বিকারগুলো থেকে মনকে মুক্ত করার জন্য একটুও

প্রযত্ন করবো না? ধর্মের সারবস্তু হারিয়ে গেলে যতটা ক্ষতি হয়, তার চেয়ে কয়েকগুণ বেশী ক্ষতি হয় যদি আমরা নিঃসারকে সার মনে করে তার সাথে একাত্ম হয়ে যাই। এর ফলে রোগ অসাধ্য হয়ে যায়।

ধর্মের শুদ্ধতাকে জানা, বোঝা, দেখা, পরীক্ষা করা, রোগমুক্তির সর্বপ্রথম আবশ্যক পদক্ষেপ। শুদ্ধ ধর্ম সর্বদাই স্পষ্ট এবং সুবোধ্য হয়ে থাকে। তাতে রহস্যময়ী গ্রন্থি থাকে না। সেখানে কোন ধাঁধাঁ থাকে না। মানসিক ব্যায়াম থাকে না। প্রতীক এবং অতিশয়োক্তিতে ভরা পাণ্ডিত্য-প্রদর্শন থাকে না। যা কিছু থাকে তা সহজই হয়। ধর্মের শুদ্ধতা এতেই, যে তাতে অনুমান এবং কপোল-কল্পনার স্থান নেই। যা কিছু থাকে, তা যথার্থই। কেবল সিদ্ধান্ত নিরূপণ ধর্ম নয়। স্বয়ং সাক্ষাৎকার, স্বয়ং অনুভব করার জন্যই ধর্ম। ধর্ম রাজপথের ন্যায় ঋজু। তাতে অন্ধগলি থাকে না যেগুলো মানুষকে বিভ্রান্ত করে। ধর্ম এখানেই, এই জন্মেই ফল প্রদান করে। যতটা পালন করা যায় ততটা ফল প্রদান করে। ধর্ম আদি, মধ্য, অন্ত—সকল অবস্থাতেই কল্যাণকর হয়। ধর্ম সর্বসাধারণের জন্য সমানভাবে গ্রহণযোগ্য হয়। এরূপ হলেই ধর্ম যথার্থ, শুক্ল এবং শুদ্ধ। অন্যথায় ধর্মের নামে কোন ধোঁকাই হতে পারে।

শুদ্ধ ধর্ম কি?

বাক্‌কর্ম, কায়কর্ম, জীবিকা, মানসিক সুস্থতার অভ্যাস, সজাগ থাকার অভ্যাস, শুদ্ধ একাগ্রতার অভ্যাস, শুদ্ধ মানসিক চিন্তন এবং জীবনের প্রতি শুদ্ধ দৃষ্টিকোণ—এ'ই শুদ্ধ ধর্ম।

মোটামুটি ভাবে বলতে গেলে—

(১) দান—অহংকারবিহীন নিঃস্বার্থভাবে প্রদত্ত দান—শুদ্ধ ধর্ম।

(২) শীল—সদাচার পালন করা, হিংসা, চুরি, ব্যভিচার, মিথ্যাভাষণ এবং নেশার দ্রব্য সেবন থেকে বিরতি — শুদ্ধ ধর্ম।

(৩) সমাধি—মনকে বশীভূত করা, তাকে একাগ্র করে বর্তমানের প্রতি সজাগ থাকার অভ্যাস করা—শুদ্ধ ধর্ম।

(৪) প্রজ্ঞা—'আমি' 'আমার' অথবা প্রিয়-অপ্রিয় মূলক আসক্তি ও বিদ্বেষ থেকে বিরত থেকে প্রত্যেক ব্যক্তি, বস্তু এবং স্থিতিকে যা যেমন

আছে, তাকে তেমন—যথাভূত প্রজ্ঞাপূর্বক দেখার অভ্যাস, চিত্তের সমতার অভ্যাস—শুদ্ধ ধর্ম।

দান, শীল, সমাধি এবং প্রজ্ঞার অভ্যাস সর্বজনীন, সাম্প্রদায়িকতাবিহীন, সর্বজনহিতকারী এবং সর্বজনগ্রাহ্য—এ কারণে এইটাই খোলস বিহীন শুদ্ধ ধর্ম। কিন্তু এই শুদ্ধ ধর্মের অভ্যাস না করে যদি মনে করি যে আমি ধার্মিক, এর চেয়েও বেশী যদি চাই যে লোকে আমাকে ধার্মিক বলে মানুক—তাহলে ধর্মের নামে বিজ্ঞাপন প্রচার করা হয়। আমরা নানা প্রকার বাহ্যাচার করি, নানাপ্রকার দার্শনিক বাদ-বিবাদ করি, বাক্‌বিলাস আর বুদ্ধিবিলাস করি, আর এইভাবে আত্মপ্রবঞ্চনা এবং জগৎকে প্রবঞ্চনার জঞ্জালে আমরা জড়াতে থাকি। এতে না আত্মহিত সাধিত হয়, না পরহিত।

আত্মহিত এবং পরহিতের জন্য শুদ্ধ ধর্মের জীবন যাপন অনিবার্য। শুদ্ধ ধর্মের জীবন যাপনের জন্য ধর্মের শুদ্ধতাকে জানা অনিবার্য। ভুষি থেকে ধানকে, খোলস থেকে সারকে আলাদা করা অনিবার্য। সারকে গুরুত্ব দিতে শিখলেই সার গ্রহণ করা সম্ভব হবে।

শুদ্ধ ধর্মের সার গ্রহণ না করলে দ্বেষ, দ্রোহ, দৌর্মনস্য, দুরাগ্রহ, অভিনিবেশ, হঠকারিতা, পক্ষপাত, সংকীর্ণতা, গোঁড়ামি, ভয়, আশঙ্কা, অবিশ্বাস, আলস্য, প্রমাদ ইত্যাদিতে পরিপূর্ণ জীবন নিস্তেজ, নিষ্প্রাণ, নিরুৎসাহই হবে; কুৎসিত, কলুষিত, কুটিলই হবে; ব্যাকুল, ব্যথিত, ব্যগ্রই হবে। শুদ্ধ ধর্মের সার গ্রহণ করতে পারলে ভালবাসা এবং করুণা, স্নেহ এবং সদ্‌ভাব, ত্যাগ এবং বলিদান, সহযোগ এবং সহকার, শ্রদ্ধা এবং বিশ্বাস, অভ্যুদয় এবং বিকাশে পরিপূর্ণ জীবন ওজস্বী, তেজস্বী হবে; উদাত্ত, অভয়, নিশ্চিন্ত হবে; সহজ, সরল, স্বচ্ছ হবে; মঙ্গল, কল্যাণ, স্বস্তিতে ভরপুর হবে।

শুদ্ধ ধর্মের এটাই প্রত্যক্ষ লাভ। প্রত্যক্ষ লাভই শুদ্ধ ধর্মের সারকে যাচাই করার যথার্থ কষ্টিপাথর।

ধর্ম ন মিথ্যাচার

ধর্ম ন মিথ্যা রূঢ়িয়াঁ, ধর্ম ন মিথ্যাচার।
ধর্ম ন মিথ্যা মান্যতা, ধর্ম সত্য কা সার।।

জটা-জূট মালা তিলক, হুয়ে শীষ কে ভার।
ভেষ বদল কর ক্যয়া মিলা? অপনা চিত্ত সুধার।।

কর্মকাণ্ড ন ধর্ম হ্যয়, ধর্ম ন বাহ্যাচার।
ধর্ম চিত্ত কী শুদ্ধতা, সেবা, করুণা, প্যার।।

গুণ তো ধারণ না কিয়া, রহে নাওয়াতে মাথ।
বহা ধর্ম রস, রহ গয়া ফুটা বর্তন হাথ।।

অন্তর মেঁ জাগে ধর্ম, দুর্গুণ হোয়েঁ দূর।
সদগুণসে সদভাবসে, রহে হৃদয় ভরপুর।।

ভিতর বাহর স্বচ্ছ হোঁ, করেঁ স্বচ্ছ ব্যবহার।
সত্য, প্রেম, করুণা জগে, য়েহি ধর্ম কা সার।।

৪

ধর্ম ধারণ করুন

ধর্ম ধারণ করাতেই যথার্থ কল্যাণ হয়।

ধর্মচর্চা কখনও লাভপ্রদ হতে পারে, কখনও বা লাভপ্রদ হয় না, আবার কখনও হানিপ্রদও হতে পারে।

ধর্মচিন্তা কখনও লাভপ্রদ হতে পারে, কখনও বা লাভপ্রদ হয় না, আবার কখনও হানিপ্রদও হতে পারে।

কিন্তু ধর্ম ধারণ করলে তা সর্বদাই লাভপ্রদ হয়।

ধর্মচর্চা করে ধর্ম সম্বন্ধে শ্রুত-জ্ঞান লাভ করা যায়। ইহাই আমাদের প্রেরণা এবং মার্গদর্শন প্রদান করে; ফলতঃ যদি আমরা ধর্ম ধারণ করি তাহলে ধর্মচর্চা আমাদের লাভেরই কারণ হয়ে থাকে। কিন্তু যখন এর দ্বারা আমরা কেবল বুদ্ধিবিলাসই করে থাকি তাহলে ধর্মচর্চা আমাদের জন্য লাভপ্রদ হতে পারে না। যখন এই শ্রুত-জ্ঞান আমাদের মধ্যে জ্ঞানী হবার মিথ্যা দম্ভ উৎপাদন করে তখন ধর্মচর্চা আমাদের হানিরই কারণ হয়ে থাকে।

ধর্মচিন্তন সম্বন্ধেও একই কথা প্রযোজ্য। ধর্মের চিন্তন-মনন বুদ্ধির স্তরে জ্ঞান উৎপাদন করে নিরর্থক বুদ্ধিবিলাসের কারণ হয়ে থাকে। অথবা মিথ্যা দম্ভ উৎপাদন করে হানির কারণ হয়ে থাকে। কিন্তু যখন এই চিন্তন-জ্ঞান ধর্ম ধারণ করার প্রেরণা যোগায়, মার্গদর্শন প্রদান করে এবং ফলতঃ আমরা ধর্ম ধারণ করি তাহলে তা কল্যাণেরই কারণ হয়ে থাকে।

বাস্তবিক কল্যাণ তো ধর্ম ধারণ করার মধ্যেই নিহিত আছে, মিথ্যা বুদ্ধিবিলাসে নয়, মিথ্যা দম্ভে নয়।

অতএব সাধকগণ আসুন! ধর্মকে ধারণ করুন। ধর্মকে ধারণ করে নিজে শীলবান হোন, সমাধিবান হোন, প্রজ্ঞাবান হোন। এটাই মঙ্গলের উৎস।

ধারণ করনা ধর্ম হ্যয়

জীবন মেঁ ধারণ কিয়ে, ধর্ম হোয় ফলবন্ত।
বিন ঔষধি সেবন কিয়ে, কহাঁ রোগ কা অন্ত?

জানে সমঝে ধর্ম কো, পর ন করে ব্যবহার।
বৃথা বোঝ ঢোতা ফিরে, ক্যয়সা মূঢ় গঁওয়ার।।

ধারণ করনা ধর্ম হ্যয়, বরনা কোরী বাত।
সূরজ উগে প্রভাত হ্যয়, বরনা কালী রাত।।

ধর্ম ধার নির্মল বনে, রাজা হো ইয়া রঙ্ক।
রোগ, শোক, চিন্তা মিটে, নির্ভয় হোয় নিঃশঙ্ক।।

শুদ্ধ ধর্ম ধারণ করেঁ, করে দূর অভিমান।
মিলে অমিত সন্তোষ সুখ, ধর্ম সুখোঁ কী খান।।

ধারণ করলে বাওরে, বিন ধারে নহিঁ ত্রান।
যোগ-ক্ষেম দাতার হ্যয়, ধর্ম বড়া বলবান।।

৫
বুদ্ধি-বিলাস ধর্ম নহে

চিন্তন-মনন দ্বারা ধর্মের সিদ্ধান্তকে জানলেই আমাদের প্রকৃত লাভ হয় না। রসগোল্লা মিষ্টি এটা শুধু জানলে ও বুঝলেই আমাদের মুখ মিষ্টি হয়ে যায় না। তার জন্য রসগোল্লাকে জিভের উপর রাখতেই হবে। দুধ পুষ্টিকারক এটা শুধু জানলে ও বুঝলে আমাদের দেহ পুষ্ট হয়ে যায় না। দেহের পুষ্টির জন্য আমাদের দুধ পান করতেই হবে। জানাকে এবং বোঝাকে আমাদের কল্যাণের প্রথম সিঁড়ি বলা যেতে পারে। কিন্তু কেবল জেনে এবং বুঝে যদি থেমে যাই এবং যেটাকে জেনেছি এবং বুঝেছি তাকে জীবনে কাজে না লাগাই, তাহলে এই জানা এবং বোঝা ব্যর্থ, তা শুধু বুদ্ধি-বিলাস এবং মানসিক ব্যায়াম মাত্র। আর আমরা তো এটাই করে থাকি।

ধার্মিক এবং দার্শনিক সিদ্ধান্ত সমূহের বাদ-বিবাদ, চর্চা-পরিচর্চা, খণ্ডন-মণ্ডন, তর্ক-বিতর্ক, ব্যঞ্জনা-বিশ্লেষণ, বোঝা-বোঝানো, শোনা-শোনানো, পড়া-পড়ানো, লেখা-লেখানো এবং বলা-বলানোতেই আমরা নিজেদের সারা জীবন কাটিয়ে ফেলি এবং এটাই দুর্ভাগ্য যে এতেই নিজেদের জীবনের সাফল্য বলে মনে করি।

নিজের ধর্মজিজ্ঞাসা পূর্ণ করা তথা বুদ্ধির স্তরে উপলব্ধ ঐ ধর্মজ্ঞানকে ব্যাঞ্জনাপূর্ণ ভাষায় ব্যক্ত করার ক্ষমতা লাভ করার মধ্যেই আমাদের পরম তুষ্টি হয়ে থাকে। এই সন্তুষ্টিকেই আমরা জীবনের অন্তিম লক্ষ্য বলে মনে করি। বাস্তবিক, কি আকর্ষণীয় এই মায়াজাল যাতে আমরা এত সহজেই জড়িয়ে পড়ি! আবার এই বন্ধনকেই ভূষণ মনে করে আমরা গর্ব অনুভব করি!

চাখ ধর্ম কা স্বাদ

মত কর, মত কর, বাওলা, মত কর বাদ-বিবাদ।
খাল বাল কী খৈঁচ মত চাখ ধর্ম কা স্বাদ।।

কিতনে দিন য়ূঁ হী গ্যয়ে, করতে বুদ্ধি-বিলাস।
ধর্ম স্বাদ চাখা নহীঁ, বুঝি ন মনকি প্যাস।।

চর্চা হী চর্চা করে, ধারণ করে ন কোয়।
ধর্ম বিচারা ক্যয়া করে ধারে হী সুখ হোয়।।

য়েহী ধর্ম কা নিয়ম হ্যয়, য়েহী ধর্ম কী রীত।
ধারে হী নির্মল বনে, পাওন বনে পুনীত।।

জীবন সারা খো দিয়া, গ্রন্থ্ পঢ়ন্ত পঢ়ন্ত।
তোতে ময়না কী তরহ, নাম রটন্ত রটন্ত।।

মানব জীবন রতন সা, কিয়া ব্যর্থ বরবাদ।
চর্চা কর লী ধরম কী, চাখ ন পায়া স্বাদ।।

৬
ধর্মের যথার্থ মূল্যায়ন

ধর্মের যথার্থ মূল্যায়ন করতে শিখুন। যদি যথার্থ মূল্যায়ন করতে থাকেন তাহলে দৃষ্টি সম্যক্ থাকবে, দুধ আর জলের পার্থক্যের বিষয়ে বিবেক জাগ্রত থাকবে, ধর্মপথে চলার সময় নিজের সঠিক ভারসাম্য বজায় রাখতে পারবেন। অন্যথায় ধর্মের কোন এক অঙ্গ প্রয়োজনের অধিক গুরুত্ব পেয়ে ধর্ম-শরীরের সর্বাঙ্গীণ উন্নতিতে বাধা সৃষ্টি করবে। সম্যক্ দৃষ্টি হ'ল এই যে যার যতটা মূল্য তাকে ততটা গুরুত্ব দেওয়া। বেশীও নয়, কমও নয়। কাঁকর, পাথর, কাচ, হীরা, মোতী, নীলা, মণি প্রত্যেকটিরই নিজ নিজ গুরুত্ব আছে। মাটি, লোহা, তামা, পিতল, রূপা, সোনা প্রত্যেকটির আলাদা-আলাদা মূল্য আছে। যার যতটা গুরুত্ব তার ততটাই মূল্য। সাংসারিক ক্ষেত্রে কাচ আর হীরা, মাটী আর সোনার যেমন এক মূল্য হতে পারে না, ধর্মের ক্ষেত্রেও সব অঙ্গের একই মূল্য হতে পারে না। তা না হলে যেটা সারহীন খোলসমাত্র তাকেও ধর্ম বলে মেনে বসে থাকবেন অথবা ধর্মের কোন এক সাধারণ প্রাথমিক অবস্থাকেই সব কিছু মনে করে শুদ্ধ ধর্মের উচ্চতম অবস্থাতে কখনও পৌঁছতে পারবেন না।

যেমন, দান করা ভাল। দান ধর্মেরই একটি অঙ্গ। কিন্তু ধর্মের মানদণ্ডে দানেরও পৃথক মূল্যায়ন হওয়া দরকার। এই মূল্যায়ন বিত্ত-ভিত্তিক নয়, নৈতিক। দান বেশী বা কম এর কোন গুরুত্ব নেই। কিন্তু দান দেবার সময় চিত্তের চেতনা কিরূপ থাকে, তাতেই ধ্যান দিতে হবে। যদি সেই সময় চিত্তে ক্রোধ, অস্থিরতা, ঘৃণা, বিদ্বেষ, ভয় বা আতংক থাকে অথবা বিনিময়ে কিছু পাওয়ার তীব্র লালসা বা যশোলাভের প্রবল কামনা বা প্রতিযোগিতার উৎকট ভাব থাকে, তাহলে এই দান শুদ্ধ, নিষ্কাম, নিরহঙ্কার চিত্তে প্রদত্ত

দান অপেক্ষা অনেক নিকৃষ্ট, পরিমাণে যত বেশীই হোক না কেন। শুদ্ধ চিত্তে প্রদত্ত দানের অনেক গুরুত্ব আছে। এর দ্বারা অপরিগ্রহ ও ত্যাগধর্ম পুষ্ট হয়। আবার এর গুরুত্বের অতিরঞ্জন করে একেই যদি সব কিছু বলে মেনে বসে থাকেন, তাহলে ধর্মের অন্যান্য অঙ্গের অবহেলা করা হবে এবং ফলতঃ তারা দুর্বল থেকে যাবে।

এইরূপ, উপবাসও ধর্মের একটা অঙ্গ। আমরা উপবাসের দ্বারা শরীরকে সুস্থ রাখি। সুস্থ শরীরেই ধর্মকে ভালভাবে পালন করা যায়। শারীরিক স্বাস্থ্য ছাড়াও মানসিক সংযমের জন্যও উপবাস উপযোগী। কিন্তু উপবাস করে মন যদি সুস্বাদু খাদ্যর কল্পনায় মশগুল থাকে তাহলে এই উপবাসও নিম্ন স্তরের হয়ে যায়। আর যদি উপবাস করে কেবল শরীরকে নয়, মনকেও সংযত করা যায়, তাহলে সেই উপবাস হয় উচ্চ মানের। নিম্নমানের কথা ছেড়েই দিন, উচ্চমানের উপবাসকেও যদি অতিরঞ্জিত মূল্যায়ন করে তাকেই সবকিছু মেনে বসে থাকেন, তাহলে আপনি 'অহং' ভাবের শিকার হয়ে যাবেন এবং উপবাসের চেয়েও অধিক মহত্ত্বপূর্ণ ধর্মের অঙ্গসমূহ একেবারে উপেক্ষিত বা দুর্বল থেকে যাবে; সেগুলোর অভ্যাস করা তো দূরের কথা, সেগুলোকে পুষ্ট করার কথাও আমরা কখনও ভাবতে পারবো না।

উপবাসকারী শীল সদাচারে দুর্বল ব্যক্তি উপবাসকারী শীলবান ব্যক্তির চেয়ে হীন। এইরূপ ভাবে আমিষ ভোজনকারী অপেক্ষা নিরামিষ ভোজনকারী, তেল লঙ্কা মশলা যুক্ত রাজসিক ভোজনকারী অপেক্ষা সাদাসিধে সাত্ত্বিক ভোজনকারী ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ এবং উত্তম। তবে সাত্ত্বিক নিরামিষ ভোজনকারী ব্যক্তি তাঁর ঐ গুণের জন্য নিজেকে যদি অন্যদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মনে করতে সুরু করেন, তাহলে মিথ্যা 'অহং' এর কারণে শুদ্ধ ধর্মের উন্নতিপথ থেকে তিনি দূরে সরে যাবেন। ভোজন বিষয়ে মাত্রাজ্ঞ হওয়া এবং গুণজ্ঞ হওয়া—অর্থাৎ অতটুকু এবং ওরকম ভোজনই করতে হবে যতটুকু এবং যেরকম আমাদের শরীরের জন্য উপযোগী এবং আবশ্যক— এটাও ধর্মের ভাল অঙ্গ। কিন্তু তার চেয়েও ভাল এবং উত্তম অঙ্গ ধর্মের আছে—এটা না জানলে তা থেকে বঞ্চিত থেকে যেতে হবে।

নিজের অধিকাংশ সময় আলস্য, প্রমাদ এবং তন্দ্রায় যে ব্যক্তি কাটান তাঁর অপেক্ষা যিনি যথাবশ্যক কম সময় শুয়ে অধিকতর সময় সজাগ থাকেন তিনি নিশ্চিত রূপে অধিক ভাল। কিন্তু—সেই সজাগ ব্যক্তির এটা ভুললে চলবে না যে তাঁকেও ধর্মপথের আগের অনেক কিছু লাভ করতে হবে।

ভ্রমণ, দৌড়ানো, সাঁতার কাটা, ব্যায়াম করা এবং এরকমই আসন, প্রাণায়াম করা শরীরকে সুস্থ এবং প্রফুল্ল রাখার জন্য আবশ্যক ও লাভদায়ক। সেই রকম রোজ স্নান করা, শরীরকে পরিচ্ছন্ন রাখা, পরিষ্কার কাপড় পরা ভাল। স্বাস্থ্যরক্ষার ক্ষেত্রে এগুলোর নিজস্ব গুরুত্ব আছে, মূল্য আছে। কিন্তু কেবল এগুলোকেই ধর্ম বলে মেনে বসে থাকলে এবং ভেতরের (অর্থাৎ মনের) সাফাই বন্ধ রেখে কেবল বাইরের সাফাইতে লেগে থাকলে নিজেরই হানি হবে।

কেউ ব্রত পালন করেন এইজন্য যে মন যেন সংযত, নিগৃহিত, সবল, সুদৃঢ় থাকে এবং ধর্মমার্গে অবিচল আরুঢ় থাকে। কিন্তু এই ব্রতগুলোকেও সবকিছু বলে মেনে বসে থাকলে এটাই বন্ধন হয়ে থাকবে। মনকে একাগ্র করার জন্য কেউ মালা জপ করে, কেউ মনে মনে কোন মন্ত্র জপ করে। কিন্তু মনকে একাগ্র করার জন্য একটুও অভ্যাস না করে কেবল যন্ত্রবৎ মালা এবং মন্ত্র জপ করার কর্মকেই ধর্ম বলে মেনে বসে থাকা ভ্রান্তি ছাড়া আর কিছু নয়।

কেউ মন্দিরে গিয়ে নিজের উপাস্য দেবতাকে দর্শন করেন। এতে তাঁর মনে শ্রদ্ধা উৎপন্ন হয়। শ্রদ্ধা থেকে মনে সৌমনস্যতা জাগে। সৌমনস্যতা চিত্তকে একাগ্র করার পক্ষে সহায়ক হয়। নিজের উপাস্য দেবতার মূর্তি চোখ খুলে যেমন দেখা হয়, চোখ বন্ধ করে তেমন বারবার ঐ মূর্তির ধ্যান করার অভ্যাস করতে থাকলে বন্ধ চোখের সামনেও সেই আকৃতি আসতে থাকে। এই ভাবেও চিত্তকে একাগ্র করার সাধন আয়ত্ত করা যায়। আকৃতির ধ্যান করতে করতে উপাস্য দেবতার গুণাবলীর ধ্যান করতে সুরু করেন এবং নিজের জীবনে ঐ গুণাবলী অর্জন করতে সচেষ্ট হন। এটা বাস্তবিকই

কল্যাণকারী। কিন্তু আমরা তা করি না, কেবল মন্দিরে গিয়ে মূর্তির সামনে যন্ত্রবৎ মাথা নত করাকেই ধর্ম বলে মনে করি। ধর্মের এইরূপ ভুল মূল্যায়নের কারণে আমরা কেবল কুসংস্কারেই জড়িয়ে থাকি।

এইরূপ, ভজন কীর্তন হচ্ছে তাতে লীন হওয়ার জন্যই—এটি চিত্তকে একাগ্র করার সাধন। কিন্তু এর থেকে অধিক অন্য কিছুকে যদি মানতে সুরু করি, তাহলে আবার আমরা প্রতারণার মধ্যেই পড়ে যাবো। কোন গুরু বা সাধুর দর্শন, তাঁকে প্রণাম করা, তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা উৎপন্ন করার জন্যই। তাঁর গুণাবলী দেখে মনে প্রেরণা জাগাতে হবে এবং ঐ গুণাবলী স্বয়ং ধারণ করতে হবে। কিন্তু এর চেয়ে অধিক তাঁর মূল্যায়ন করা সুরু করলে আমরা বিবেক হারিয়ে ফেলি এবং অন্ধ শ্রদ্ধার ফলে বুদ্ধি জড় হতে সুরু করে। কেউ ধর্মগ্রন্থ পাঠ করেন অথবা শ্রবণ করেন—এইজন্যই যেন তা থেকে দর্শন আমরা প্রেরণা পাই, মার্গ, লাভ করি, যেন ধর্মকে জীবনে লাভ করতে পারি। কিন্তু এটা ভুলে গিয়ে কেবল শ্রবণ এবং পাঠকেই যদি আমরা সবকিছু বলে মনে করি তাহলে মিথ্যাদৃষ্টির চোরাবালিতে আমাদের জীবন-গাড়ীর চাকা আটকে যাবেই।

কেবল যে বাকচাতুর্য এবং বুদ্ধিবিলাস ধর্ম নয়। জীবনে শীল সদাচার ধারণ করেছি, তাই ধর্ম। শীল-সদাচারেরও আলাদা শ্রেণী আছে। অহিংসা, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য, সত্যবাদিতা এবং অপ্রমাদ—এই শীলগুলোর মধ্যে কেউ একটা, কেউ বা দুটো, কেউ বা তিনটে, কেউ বা চারটে, কেউ বা পাঁচটা পালন করেন। কাজেই ক্রম অনুসারে একজনের চেয়ে আর একজন বেশী ধার্মিক। এর মধ্যেও আবার কেউ কেউ কোন বিশেষ শীল পালন করেন অনুকূল পরিবেশ পেয়েছেন বলেই অর্থাৎ শীল পালনের অনুকূল পরিবেশে তিনি জন্মগ্রহণ করেছেন, পালিত হয়েছেন এবং রয়েছেন। কিন্তু আবার কেউ কেউ আছেন যাঁরা প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে থেকেও শীল পালন করেন, মনকে নিজের বশে রাখেন। এই দুই শ্রেণীর মধ্যে দ্বিতীয় শ্রেণীর ব্যক্তিই শ্রেষ্ঠ।

মনকে নিজের বশে রাখা ধর্মের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। এটাই সমাধি। কিন্তু কোন ব্যক্তি সমাধি লাভ করার জন্য যে অবলম্বনের প্রয়োগ করেন, সেটা যদি আসক্তি, বিদ্বেষ বা মোহবর্ধক হয়, তাহলে সে ব্যক্তি দূষিত চিত্ত নিয়েই সমাধিস্থ হন। আর যে ব্যক্তি এমন অবলম্বন গ্রহণ করেন যা আসক্তি, বিদ্বেষ এবং মোহের ক্ষয়কারী, তাহলে সে ব্যক্তি প্রথম ব্যক্তি অপেক্ষা উত্তম। দূষিত চিত্তের একাগ্রতার দ্বারা মনোবল প্রাপ্ত হয়েও কেউ কেউ অনেক ঋদ্ধি এবং সিদ্ধি লাভ করতে পারে এবং এর শক্তিতে সাধারণ লোকদের চমকে দিয়ে অনেক অদ্ভুত কিছু দেখাতে পারে। কিন্তু এ জাতীয় ঋদ্ধি এবং সিদ্ধিকে ধর্ম বলে মেনে নেওয়া বিপজ্জনক। যিনি ঐ জাতীয় ঋদ্ধি-সিদ্ধি লাভ করেছেন তিনি যে ধর্মপরায়ণ হবেন, এমন কোন কথা নেই। অনেক দুঃশীল ব্যক্তিকেও অনেক চমৎকারিত্ব প্রদর্শন করতে দেখা যায়। অতএব, চমৎকারিত্বের আধারের উপর ধর্মের মূল্যায়ন করা যায় না। করলেও সেই মূল্যায়ন ভুল হবে। সমাধির সঙ্গে শীলের ভূমিকাও অনিবার্য।

শুদ্ধ সমাধির মার্গেও বিভিন্ন উপলব্ধি হয়। কখনও আমরা একনাগাড়ে তিন ঘণ্টা এক আসনে বসে থাকতে পারি। কিন্তু এরূপ আসন-সিদ্ধি সাধনার অন্তিম লক্ষ্য নয়। এই প্রকার একাগ্রতার অভ্যাসের সময় কখনও কখনও বন্ধ চোখের সামনে আমরা প্রকাশ, জ্যোতি, রূপ, রঙ্, আকৃতি, দৃশ্য প্রভৃতি দেখতে পাই। কখনও কখনও কানে অপূর্ব শব্দ শুনতে পাই, নাকে অপূর্ব ঘ্রাণ আসে, জিভ দিয়ে অপূর্ব রস আস্বাদন করি, শরীর দিয়ে কোন অপূর্ব স্পর্শের অনুভব করি এবং এ সকল ভিন্ন ভিন্ন অতীন্দ্রিয় অনুভূতিগুলোকে দিব্য জ্যোতি, দিব্য শব্দ, দিব্য গন্ধ, দিব্য রস এবং দিব্য স্পর্শ বলে মনে করে যদি এগুলোকে প্রয়োজনের বেশী গুরুত্ব দিতে সুরু করি তাহলে বিপথগামী হয়ে পড়ি। এই প্রকার সমাধির অভ্যাসকালে কখনও কখনও শ্বাস সূক্ষ্ম হতে হতে অনায়াসে স্তব্ধ হয়ে যায়, আপনা থেকেই 'কুম্ভক' হতে সুরু করে। অভ্যাস করতে করতে বিচার এবং বিতর্কের প্রবাহ মন্দ হতে সুরু করে এবং কখনও কখনও নির্বিচার, নির্বিকল্প

অবস্থা এসে যায়। একাগ্রতা বাড়তে থাকলে ভেতরে প্রীতি-প্রমোদ জাগে। আনন্দের লহরী উঠতে থাকে। মন এবং শরীর রোমাঞ্চ এবং পুলকে ভরে ওঠে। শরীর অনেক হাল্কা মনে হয়। কিন্তু এই ভিন্ন ভিন্ন প্রিয় অনুভূতিগুলোকেই সব কিছু মনে করে যদি এইগুলোর অতিশয়োক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যা করতে সুরু করি তাহলে পথ ভুল হয়। এই অনুভূতিগুলো লম্বা রাস্তার স্থানে স্থানে মাইল পোষ্টের মতো। এগুলোর কোন একটিতে আসক্ত হয়ে পড়লে সেটাই বোঝা হয়ে দাঁড়াবে, এগিয়ে যাওয়া মুসকিল হবে। এই অনুভূতিগুলো যেন ধর্মশালা। এগুলোর কোন একটাকে অন্তিম লক্ষ্য মনে করে সেখানেই যদি থেমে যাই, তাহলে আর সামনের পথে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে না। যাত্রা বন্ধ হয়ে যাবে। প্রথম ধ্যান থেকে অষ্টম ধ্যান পর্য্যন্ত সকল সমাধি একটার চেয়ে পরেরটা বেশী উন্নত। কিন্তু আটটি ধ্যানে পারঙ্গম হলেও আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে সম্পূর্ণতা লাভ হয়েছে বলে মেনে নেওয়া যায় না। আটটি সমাধি-সমাপত্তিতে সহজ অনুভূতি উপলব্ধকারী সাধকেরও প্রজ্ঞাবান হওয়া নিতান্ত আবশ্যক।

একজন প্রজ্ঞাবান এবং অন্য প্রজ্ঞাবানের মধ্যেও ভেদ আছে। কোন প্রজ্ঞাবান এমন যিনি শ্রুতময়ী প্রজ্ঞা আয়ত্ত করেছেন অর্থাৎ যিনি পড়াশুনা করে প্রজ্ঞা সম্বন্ধে জেনেছেন। দ্বিতীয় প্রজ্ঞাবান যিনি চিন্তাময়ী প্রজ্ঞা আয়ত্ত করেছেন অর্থাৎ যিনি পড়াশুনার দ্বারা লব্ধ জ্ঞানকে চিন্তন-মনন দ্বারা বুদ্ধির মানদণ্ডে যাচাই করে যুক্তিসঙ্গত মনে করে তাকে স্বীকার করে নিয়েছেন। প্রথম শ্রেণীর প্রজ্ঞাবান অপেক্ষা দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রজ্ঞাবান উত্তম। কিন্তু এই দুই শ্রেণীর প্রজ্ঞাবান অপেক্ষা তৃতীয় শ্রেণীর প্রজ্ঞাবান উত্তম যিনি ভাবনাময়ী প্রজ্ঞাকে আয়ত্ত করেছেন অর্থাৎ যিনি প্রত্যক্ষ অনুভূতির বলে স্বয়ং নিজের প্রজ্ঞা জাগ্রত করেন।

আমরা নিজের অনুভূতির বলে প্রজ্ঞা জাগ্রত করেছি না অন্যের প্রাপ্ত প্রজ্ঞার বলে কেবল বুদ্ধিরঞ্জন করছি, স্বয়ং বিচার করে চলতে হবে। প্রজ্ঞার নামে যদি কেবল বুদ্ধিরঞ্জনই হয়, তাহলে জীবনের বিষম পরিস্থিতিতে মন উত্তেজিত ও উদ্বেলিত না হয়ে থাকতে পারবে না।

ভাবনাময়ী প্রজ্ঞার যতই অভাব হবে মানসিক অসাম্য ততই অধিক হবে। ভাবনাময়ী প্রজ্ঞার বলে যদি ব্যক্তি, বস্তু ও স্থিতিকে তারা যে রকম আছে তেমনই, তার যথার্থ স্বরূপ এবং তার প্রকৃত গুণ, ধর্ম ও স্বভাবকেই দেখি—তাহলে নিজের মনের ভারসাম্য নষ্ট হয় না। অন্তর্মনে সঞ্চিত দৌর্মনস্যের বিভিন্ন গ্রন্থিগুলো নিজে নিজে খুলতে আরম্ভ করে। চিত্তের কলুষ দূর হয়ে যায়। তাতে নির্মলতা আসে। নির্মলতা এলেই—সংকীর্ণতার স্থানে উদারতা, দুর্ভাবনার স্থানে সদ্‌ভাবনা, বিদ্বেষের স্থানে প্রেম, ঈর্ষার স্থানে মুদিতা এবং শত্রুতার স্থানে মৈত্রী উৎপন্ন হয়। এই সকল সদ্‌গুণ জীবনে আসছে কি না, আমাদের দৈনন্দিন জীবনের ব্যবহারে সেগুলো প্রকট হয় কি না, এই মানদণ্ডের দ্বারা ধর্মের ক্ষেত্রে আমরা নিজেদের উন্নতির পরিমাপ করতে পারি। প্রজ্ঞায় যে রকম স্থিত হতে থাকবেন, সেই রকম শীল পুষ্ট এবং সমাধি সুদৃঢ় হতে থাকবে। মন বশে থাকতে সুরু করবে। সদাচারই জীবনের সহজ স্বভাব হয়ে যাবে। তার জন্য কোন বিশেষ প্রচেষ্টা করতে হবে না। নিজের অন্ধ স্বার্থের জন্য অন্যদের ক্ষতি করার সংকীর্ণ বুদ্ধি দূর হয়ে যাবে। নিজের সুখ-সাধন অন্যদের মধ্যে বণ্টন করে দিয়ে অংশীদার করার দানপ্রবৃত্তি সহজভাবেই জীবনের অঙ্গ হয়ে যাবে। এইভাবে যতই ধর্মের সর্বাঙ্গীণ পুষ্টি সুরু হবে ততই নানা কুসংস্কার যা পূর্বে ধর্মসাধন রূপে গ্রহণ করা হয়েছিল এবং যেগুলোকে না বুঝে নিজের আধ্যাত্মিক সিদ্ধি বলে মনে করে বুকে বেঁধে রাখা হয়েছিল, সাপের খোলস পাল্টানোর মতো বিনা কষ্টে এবং বিনা প্রয়াসে আপনা থেকেই তা খসে পড়ে যাবে। আর যে নতুন ত্বক উৎপন্ন হবে তা নিষ্প্রাণ নয়, প্রকৃত ধর্মে তা হবে উজ্জ্বল।

ত্বকের নিজস্ব গুরুত্ব আছে। কিন্তু নিষ্প্রাণ হয়ে গেলেও তাকে ধারণ করে রাখাই হচ্ছে অজ্ঞানতা। খোলসেরও নিজস্ব গুরুত্ব আছে। কিন্তু তার উপযোগিতা ফুরিয়ে গেলেও মোহবশে তাকে ধারণ করে রাখাটা অজ্ঞানতা। শুদ্ধ প্রজ্ঞা পুষ্ট হলে সকল বস্তুর যথার্থ মূল্যায়ন হয়। লোভনীয় তর্কজালের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে কোন উপযোগী বস্তুকে নষ্ট

করা এবং পরম্পরার প্রতি ভাবাবেশময়ী আসক্তির কারণে কোন মূল্যহীন বস্তুকে গলায় জড়িয়ে রাখা বন্ধ হয়। পুষ্ট প্রজ্ঞার ফলে এমন বিশুদ্ধ বিবেক জাগে যার ফলে অসার তর্কজাল বা অন্ধ ভাবাবেশ টিকতে পারে না। ধর্মের প্রত্যেক অঙ্গের যথার্থ মূল্যায়ন হওয়ার দরুন ধর্মের সর্বাঙ্গীন এবং সমুচিত বিকাশ হতে সুরু করে।

সর্বাঙ্গীণ এবং সমুচিত বিকাশ না হলে আমরা নিজেদের স্বাস্থ্য হারিয়ে ফেলি। শরীরে কোন একটি অঙ্গ যদি প্রয়োজনের অতিরিক্ত বিকশিত হয় এবং বাকি অঙ্গগুলো অবিকশিত থেকে যায়, তাহলে গোটা শরীরের সঙ্গে বিকশিত অঙ্গটিকেও রুগ্নই বলা হয়ে থাকে। সেই রকম ধর্ম-শরীরেরও কোন এক অঙ্গ বেশী বিকশিত হয়ে গেলে অন্য অঙ্গগুলোর বিকাশের পক্ষে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। ফলে ধর্মশরীর তো রুগ্ন হয়ই, ঐ বিকশিত অঙ্গবিশেষকেও রুগ্নই বলা হয়ে থাকে। অতএব গোটা ধর্মশরীরকে সুস্থ এবং সবল রাখার জন্য ধর্মের সমস্ত অঙ্গগুলোই বিকশিত হওয়া প্রয়োজন। এই জন্য সমস্ত অঙ্গের বিবেক পূর্বক সমুচিত মূল্যায়ন হওয়া আবশ্যক।

মালা তিলকের ন্যায় বাহ্যাড়ম্বর, নদী-স্নান, তীর্থ-পর্যটনের ন্যায় কর্মকাণ্ড, অথবা আত্মবাদ, অনাত্মবাদের ন্যায় বুদ্ধি-রঞ্জনীয় দার্শনিক মান্যতা ইত্যাদির কথা ছেড়েই দিন, যদি আমরা কোন ভাল ব্রত পালন করার সময়, অথবা কোন শীল পালন করার সময় তার অতিরঞ্জন করতে সুরু করি এবং শুদ্ধ ধর্মের অন্য অঙ্গগুলোর অবহেলা করে কেবল ঐ শীলব্রতে আসক্ত হয়ে পড়ি, তাহলে ঐ শীলব্রতে আসক্তি আমাদের জন্য ভয়ংকর ব্যাধি হয়ে দাঁড়াবে। এর থেকে বাঁচার জন্য এবং শুদ্ধ ধর্মের সর্বাঙ্গীণ এবং সমুচিত বিকাশের জন্য প্রত্যেক কথার যথার্থ মূল্যায়ন হওয়া আবশ্যক। ধর্মময় মঙ্গল জীবন যাপন করার এটাই কল্যাণময় চাবিকাঠি।

জো ধারে সো পায়

ধর্ম ন তর্ক-বিতর্ক হ্যয়, ধর্ম ন বাদ-বিবাদ।
বিরজ বিমল চৈতন্য কা, ধর্ম পুনীত প্রসাদ।।

শুদ্ধ ধর্ম পালন করেঁ, প্রজ্ঞা জগে বিশুদ্ধ।
নীর ক্ষীর কে ভেদ কা, রহে বিবেক প্রবুদ্ধ।।

শুদ্ধ ধর্ম কা হোয় জব, সর্বাঙ্গীন বিকাস।
তো সদগুণ সদভাব কা, উজলা হোয় উজাস।।

ধর্ম ন মন্দির মেঁ মিলে, ধর্ম ন হাট বিকায়।
ধর্ম ন গ্রন্থোঁ মেঁ মিলে, জো ধারে সো পায়।।

মন্দির মন্দির ডোলতে, বৃদ্ধ হো গয়া ছৈল।
পগ কী পগতরিয়াঁ ঘিসীঁ, ঘিসা ন মন কা মৈল।।

মন্দির মসজিদ ভটকতে, কিসে মিলা ভগবান।
সেবা করুণা প্যার সে, স্বয়ং বনে ভগবান।

৭
যথার্থ কুশল!

যথার্থ কুশল কিসে আছে?

যথার্থ কুশল নিজের মনকে স্বচ্ছ ও পরিষ্কার রাখার মধ্যেই নিহিত, মঙ্গলমৈত্রী দ্বারা পূর্ণ করার মধ্যেই নিহিত।

যখন আমরা দ্বেষ-দৌর্মনস্যে ডুবে থাকি এবং কর্কশ, কঠোর বাক্য বলতে থাকি, তখন আমাদের মনের স্বচ্ছতা আমরা হারিয়ে বসি। আর যখন স্বচ্ছতা হারিয়ে ফেলি, তখন সুখ-শান্তিও হারিয়ে ফেলি।

যখন আমরা স্নেহ এবং সৌমনস্যে ভরপুর থাকি এবং মধুর মিষ্টস্বরে কথা বলি, তখন মনের মালিন্য থেকে মুক্ত থাকি। এবং যখন মনের মালিন্য থেকে মুক্ত থাকি, তখনই বাস্তবিক সুখ-শান্তি লাভ করি।

দুষিত মন অন্যদেরও দুঃখী করে। কোন কোন অবস্থাতে অন্যদের দুঃখী করতে না পারলেও সকল অবস্থাতে নিজেকে তো দুঃখী বানায়! যখনই মন বিদ্বেষ এবং দুর্ভাবনার দ্বারা দূষিত হয়ে ওঠে, তখনই অনিবার্যভাবে নিজেও অস্থির এবং চঞ্চল হয়ে পড়ি। সুমন অন্যদেরও সুখী করে। কোন কোন অবস্থাতে অন্যদের সুখী করতে না পারলেও, সকল অবস্থাতে নিজেকে তো সুখী বানায়! যখনই মন স্নেহ এবং সদ্ভাবনার দ্বারা সুমন হয়ে ওঠে, তখনই অনিবার্যভাবে নিজেও শান্তি এবং স্বস্তি লাভ করি।

সৌমনস্যতার দ্বারা পূর্ণ মন স্বয়ং সুখী থাকে। দৌর্মনস্যতার দ্বারা পূর্ণ মন স্বয়ং দুঃখী থাকে। এটাই প্রকৃতির অটুট নিয়ম। এটাই সত্য। এটাই ধর্মের নিয়ম।

সাধকগণ, প্রকৃতির অটুট নিয়মের প্রতি, এই সত্য এবং এই ধর্মের নিয়মের প্রতি সর্বদা সজাগ থাকুন এবং নিজের মনকে সৌমনস্যতার দ্বারা পূর্ণ এবং দৌর্মনস্যতা থেকে দূরে রাখার চেষ্টা করতে থাকুন।

এতেই নিজের বাস্তবিক কুশল। এতেই নিজের বাস্তবিক মঙ্গল।

মন মানস লহরায়

দ্বেষ অউর দুর্ভাব সে, আকুল-ব্যাকুল হোয়।
স্নেহ অউর সদ্ভাব সে, হরষিত পুলকিত হোয়।।

নির্ধন য়া ধনবান হো, অনপঢ় য়া বিদ্বান।
জিসনে মন ম্যয়লা কিয়া, উসকে ব্যাকুল প্রাণ।।

মন হী দুর্জন, মন সুজন, মন বৈরী মন মীত।
জীবন মেঁ মঙ্গল জগে, জব মন হোয় পুনীত।।

মন বন্ধন কা মূল হ্যয়, মন হী মুক্তি উপায়।
বিকৃত মন জকড়া রহে, নির্বিকার খুল জায়।।

অপনা সুধরা চিত্ত হী, আয়ে অপনে কাম।
জো সুখ চাহে মানবী, মন পর রাখ লগাম।।

চিত্ত হমারা শুদ্ধ হো, সদগুণ সে ভর জায়।
করুণা মৈত্রী প্যার সে, মন মানস লহরায়।।

৮

সমতা ধর্ম

সমতাই ধর্ম, বিষমতা অধর্ম। সমতা অনাসক্তি। বিষমতা আসক্তি। যেখানে আসক্তি সেখানেই দুঃখ। যেখানে অনাসক্তি সেখানেই আসল সুখ, আসল শান্তি।

বিপশ্যনা সাধনার দ্বারা আমরা দেখি যে শরীরে আধারিত এই চিত্ত ধারাতে বিবিধ কারণে সময়ে সময়ে সুখদ এবং দুঃখদ উভয় প্রকার সংবেদনা প্রকট হতে থাকে। সুখদ সংবেদনা আমাদের প্রিয় লাগে এবং তার প্রতি আমাদের অনুরাগ উৎপন্ন হয়। পরিণামে তাকে ধরে রাখার জন্য আমরা তৎপর থাকি। পাছে সেটা হারিয়ে যায়, সেজন্য আশংকিত, আতংকিত হয়ে উঠি। অসুরক্ষার হেতু অস্থিরতা অনুভব করতে থাকি। কিন্তু প্রকৃতির পরিবর্তনশীলতার কারণে এই সুখদ সংবেদনা নষ্ট হবেই। আর যখন দুঃখদ সংবেদনা প্রকট হয়, তখন তার প্রতি জাগে বিদ্বেষ। তখন তাকেই দূর করার জন্য আমরা অস্থির হয়ে উঠি। এটা কি কখনও দূর হবে না?— এই ভয় এবং আশংকায় আমরা আতংকিত হয়ে উঠি। আবার আমরা অসুরক্ষারই অস্থিরতায় বাঁধা পড়ে যাই। উভয় অবস্থাতেই আমরা অশান্ত এবং অস্থির থাকি। অনুরাগ এবং বিদ্বেষ থেকে আসক্তি জন্মে। অসুরক্ষার ভাবনা জাগে। মন তার ভারসাম্য হারিয়ে বসে। এটাই হচ্ছে বিষমতা। সুখদ-দুঃখদ যে কোন অবস্থা বর্তমান থাকাকালীন আসক্তি ও বিদ্বেষ থেকে মুক্ত থাকার নামই অনাসক্ত হয়ে থাকা। তা হলেই সুরক্ষার ভাব অনুভূত হবে। মনের ভারসাম্য নষ্ট হবে না এবং শান্ত থাকা যাবে।

সুখদ এবং দুঃখদ স্থিতির প্রতি পূর্ণ সংবেদনশীল এবং সজাগ থেকেও অবিচলিত থাকার নামই সমতা। সমতা পাথরের মতো জড়তা নয়,

শ্মশানের শান্তি নয়। যেখানে চিত্তের উত্তেজনাকারী অবলম্বন উদ্দীপনাই নেই, সেই সমতাই যে যথার্থ সমতা, তা কি ভাবে বলা যাবে? যেখানে উত্তেজনা সৃষ্টিকারী অবলম্বন-উদ্দীপনা থাকলেও উত্তেজিত হবার মতো চিত্ত সুষুপ্ত থাকে, সেই সমতাই যে যথার্থ সমতা, তা কিভাবে বলা যাবে? সমতা নেতিবাচক নয়; মূঢ়তা, মূর্ছা, কুণ্ঠা নয়। কেউ আমাকে সব্জী কাটার মতো করে কেটে যাবে, আর আমি বুঝতেও পারবো না— এরূপ অচেতন অবস্থার নাম সমতা নয়। সমতা কোন এনেসথেসিয়ার ঘ্রাণ বা মর্ফিয়ার ইন্‌জেকশান নয়। পূর্ণ চেতন অবস্থাতেই চিত্তের সাম্য বজায় রাখার নামই সমতা। অন্যথায় গভীর নিদ্রায় নিদ্রিত অথবা মূর্ছিত বা মূঢ় ব্যক্তিও সমতার দম্ভ করতে পারে।

সুখদ স্থিতিতে প্রফুল্ল হয়ে ওঠা এবং দুঃখদ স্থিতিতে উদাস হয়ে পড়ার নামই বৈষম্য। উভয় অবস্থা বর্তমান থাকাকালীন ভারসাম্য বজায় রাখাই সমতা। কিন্তু সমতা আমাদের অশক্ত এবং নিষ্কর্মা করে না। সত্যিকার সমতা এলেই প্রবৃত্তি জাগে। এই প্রবৃত্তি পরম পুরুষার্থের রূপ ধারণ করে। পরম পুরুষার্থে আপন পরের ভেদাভেদ থাকে না। এইরূপ পুরুষার্থ-প্রদায়িনী সমতা যতই সবল হবে জীবনে ততই মঙ্গল হবে। আত্মমঙ্গলও হবে, জন-সাধারণের মঙ্গলও হবে। সমতা যত দুর্বল হবে ততই নিজের এবং অন্যদেরও অনর্থ ঘটবে।

সমতা ধর্ম জীবন-জগৎ থেকে দূরে পালিয়ে যাওয়া নয়। পলায়ন নয়। জীবন-বিমুখ হওয়া নয়। সমতা ধর্ম হচ্ছে জীবন-অভিমুখ হয়ে বাঁচা। জীবন থেকে দূরে পালিয়ে কোথায় যাবেন? বিষয় থেকে দূরে পালিয়ে কোথায় যাবেন? সারা সংসার বিষয়ে পরিপূর্ণ। বিষয় আমাদের কি ক্ষতি করে? বিষয় আমাদের শত্রুও নয়, মিত্রও নয়, ভালও নয় মন্দও নয়। ভাল মন্দ হচ্ছে বিষয়ের প্রতি আমাদের নিজ নিজ দৃষ্টিকোণ। অনাসক্ত অথবা আসক্ত দৃষ্টিকোণ। সম অথবা বিষম দৃষ্টিকোণ। যদি আমরা বিষয় থেকে দূরে পালিয়ে না গিয়ে বিষয় থেকে উৎপন্ন হওয়া বিকারকে সমতা অর্থাৎ অনাসক্তি দিয়ে দেখতে শিখি, তাহলে ঐ বিষয়গুলো থাকলেও আমরা

বিকারকে নিস্তেজ করতে পারি। সমতা ও অনাসক্তি দ্বারা দেখাই বিশেষ রূপে দেখা, প্রজ্ঞাপূর্বক দেখা, সম্যক্ দৃষ্টিতে দেখা। ইহারই নাম বিপশ্যনা। সমতাময়ী বিপশ্যনার দৃষ্টি প্রাপ্ত হলে 'আমি', 'আমার', এবং আসক্তি ও বিদ্বেষ এর কুয়াশা দূর হয়ে যায়, যেটা যেমন তাকে তেমন ভাবেই দেখতে পাই, এবং তখন আমরা অন্ধ প্রতিক্রিয়া করা ছেড়ে দিই। সমতার সুদৃঢ় ভূমিতে স্থির হয়ে আমরা যা কিছুই করি না কেন, সেই ক্রিয়াই শুদ্ধ ক্রিয়া হয়, প্রতিক্রিয়া নয়। এইজন্য ইহা কল্যাণকর হয়, অমঙ্গলকারী হয় না।

ভেতরের চিত্তপ্রবাহে জাগ্রত সুখদ-দুঃখদ সংবেদনার প্রতি পূর্ণ সমতার ভাব আসতে সুরু করলে বাহ্য জীবনেও সহজ সমতা প্রকট হতে সুরু করে। বাহ্য জীবন-জগতের সমস্ত বিষমতাও আন্তরিক সমতাকে ভঙ্গ করতে পারে না। জীবনে পতন-উত্থান, জোয়ার-ভাটা, বসন্ত-পতঝড়, রোদ্র-ছায়া, বর্ষা-গ্রীষ্ম, হার-জিত, নিন্দা-প্রশংসা, মান-অপমান, লাভ-লোকসান প্রভৃতি দ্বন্দ্বের দ্বারা মন বিচলিত হয় না। সমস্ত স্থিতিতে সাম্যভাব বজায় থাকে।

আন্তরিক সমতার পুষ্টির দ্বারাই যোগ-ক্ষেম পুষ্ট হয়। ইহারই বলে হাজার প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যেও নিজের সুরক্ষার মিথ্যা ভয় দূর হয়। জীবনে বৈশারদ্য আসে, নির্ভয়তা আসে। ভবিষ্যতে কি হবে—এইজন্য চিন্তিত, ব্যথিত, আকুল ব্যাকুল হতে হয় না। আমার স্ত্রী-পুত্র, ধন-দৌলত, পদ-প্রতিষ্ঠা, মান-মর্যাদা, সত্তা-শক্তি, স্বাস্থ্য-আয়ু সুরক্ষিত থাকবে কি না—এইসব নিরর্থক চিন্তা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। প্রতি মুহূর্তে পরিবর্তনশীল প্রকৃতিকে অপরিবর্তনীয় বানিয়ে রাখার প্রমত্ত প্রয়াস, জীবন-জগতের সতত প্রবহমান ধারাকে রুদ্ধ করে রাখার উন্মত্ত আগ্রহ, জলের বুদ্বুদকে মুঠোর মধ্যে নিয়ে 'আমার আমার' বলে ধরে রাখার ন্যায় মিথ্যা নিরর্থক প্রযত্ন সহজেই দূরীভূত হয়। জীবন থেকে কুটিলতা বিষমতা উত্তেজনা স্বতঃই দূর হতে সুরু করে। পরিস্থিতি সমূহের পরিবর্তনশীল তরঙ্গসমূহকে সহজভাবেই অতিক্রম

করার শক্তি আসে। নিতান্ত কর্মশীল থাকলেও পরিণাম সমূহের প্রতি উন্মুক্ত নিশ্চিন্ততা আসে এবং সঙ্গে সঙ্গে ব্যবহারকুশলতায় পরিপক্কতা আসে। ইহাই সমতা ধর্মের মঙ্গলময় পরিণাম।

সমতা এলে মানসিক, বাক্ এবং কায়কর্মে শুদ্ধতা আসে, সামঞ্জস্য আসে। পরিণামে জীবনে সুস্থতা আসে। বাত-পিত্ত-কফে বিষমতা এলে শরীর দুর্বল হয়। সেই রকম মানসিক, বাক্ এবং কায়কর্মে বিষমতা এলে জীবনও রুগ্ন হয়। মনে এক আছে, অথচ অন্যরকম বললে বা অন্যরকম করলে অসুস্থ হয়েই যাবেন। তাল, স্বর এবং লয়ের সমতার দ্বারা যেমন তন্ময়তা আসে, সেই রকম মন-বাক্-কায় কর্মের সমতার দ্বারাও তন্ময়তা আসে। পরম সুখ প্রাপ্ত হওয়া যায়। সমতার যে সুখ তা সংসারের সমস্ত সুখের উর্দ্ধে এবং তা শ্রেষ্ঠ।

সমতাই হচ্ছে সুস্থতা। মনের সমতা নষ্ট হয়ে গেলে নানা প্রকার মানসিক রোগ, এবং তার পরিণামে শারীরিক রোগও উৎপন্ন হয়। সমতাপূর্ণ জীবনযাপনকারী কুশলী ব্যক্তিই সুস্থ জীবন যাপন করেন। সমতাময় জীবন যাপনকারীর অহংভাব, আত্মভাব নষ্ট হয়। তিনি অনাত্মভাবের মঙ্গল জীবন যাপন করেন। 'আমি' আর 'তুমি'র বিষমতাপূর্ণ একপেশে দৃষ্টিকোণ দূরীভূত হয়। সমতা-সমন্বয়ের বহুপক্ষিয় দৃষ্টিকোণ বিকশিত হয়। বিষমতা মানুষকে আসক্তির দিকে টেনে নিয়ে যায়। আসক্তি নিয়ে যায় আতিশয্যের দিকে এবং আতিশয্যের দিকে ঝুঁকে পড়ার দরুণই ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের দৃষ্টিদাষ উৎপন্ন হতে সুরু করে। "কেবল আমারই মুক্তি হোক, বাকী সমাজ জাহান্নামে যাক। এই স্ত্রী-পুত্র, ভাই-বন্ধু সবই তো বন্ধন। এদের সঙ্গে আমার কীই বা লেন-দেন? আমি কিভাবে নিজে মুক্তি পাব? এদের ভালমন্দের সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই।"—এইরূপ চিন্তাশীল ব্যক্তি আতিশয্যের এক অন্তে জড়িয়ে থাকে। কেউ কেউ আবার কেবল 'আমি' এবং 'আমার পরিবার' এই দুয়ের সীমিত পরিধিতে আকণ্ঠ ডুবে থাকে। তারা অতিশয্যের দ্বিতীয় অন্তে জড়িয়ে থাকে। সমতা ধর্ম হচ্ছে এই দু'য়ের মধ্যম পন্থার ধর্ম।

সমতা ধর্ম আত্মমঙ্গল এবং পরমঙ্গলের সমন্বয়-সামঞ্জস্যের ধর্ম। ব্যক্তি জঙ্গলের বৃক্ষ লতাগুল্মের ন্যায় স্থাবর নয়। সে জঙ্গম; চলা ফেরা করে; অন্য অনেক লোকের সঙ্গে তার সম্পর্ক এবং সম্বন্ধ। আত্মশোধনের জন্য কিছুকাল একান্তে বাস করা এবং অন্তর্মুখী হওয়া আবশ্যক এবং কল্যাণকারী, কিন্তু এই প্রকারে শুদ্ধকৃত মনকেই বর্হিজগতে সম্যক্‌ভাবে প্রয়োগ করতে পারলেই ধর্ম পুষ্ট হয়।

'আমি'র সংকুচিত বিন্দুর দ্বারা আবদ্ধ থাকার দরুণই আমাদের দৃষ্টি ধূমায়িত হয়ে যায়। কর্মসিদ্ধান্তের বৈজ্ঞানিকতা স্পষ্ট বুঝতে পারিনা। আসক্তির জন্য আতিশয্যের দিকে আমরা ঝুঁকে পড়ি, আর এটা মানতে সুরু করি যে প্রত্যেক ব্যক্তি কেবলমাত্র নিজের পূর্ব কর্মের দ্বারা প্রভাবিত হয়। অন্যদের কর্মের সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই। এটা সত্যি যে প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের কর্মের দ্বারা প্রভাবিত, কিন্তু গোটা সমাজের কর্মের দ্বারাও সে কম প্রভাবিত হয় না। ব্যক্তি নিজ কর্মের ফলোদ্ভূত পুতুল তো বটেই, কিন্তু সমগ্র মানব-সমাজের আজ পর্য্যন্ত যে প্রগতি বা অধোগতি হয়েছে সে তারও উত্তরাধিকারী। আমাদের কর্ম আমাদের তো প্রভাবিত করেই, কমবেশী অন্যদেরও প্রভাবিত করতে থাকে। আমরা নিজেদের কর্মের উত্তরাধিকার নিজের ভবধারাকে দিয়ে তো থাকিই, সঙ্গে সঙ্গে ভবিষ্যতের বংশধরদেরও কিছু কিছু দিয়ে থাকি। ব্যক্তি কখনও সমষ্টি থেকে আলাদা থাকতে পারে না, সমষ্টিও কখনও ব্যক্তির থেকে আলাদা থাকতে পারে না। ব্যক্তি কখনও সমাজ থেকে আলাদা থাকতে পারে না, সমাজও কখনও ব্যক্তি থেকে আলাদা থাকতে পারে না। উভয়েই একে অন্যের উপর আশ্রিত। একে অন্যের পরিপূরক। অতএব ব্যক্তি এবং সমষ্টির সম্পর্কে সমতা এবং সামঞ্জস্য স্থাপন করাই শুদ্ধ ধর্মের মঙ্গল পরিণাম। সমতার শুদ্ধধর্ম যতই বিকশিত হবে ব্যক্তি ততই 'আমিত্বের' সংকুচিত বিন্দু থেকে এগিয়ে যেতে পারবে। এই 'আমিত্বের' বিন্দুই নিজের সংকীর্ণ গণ্ডী সৃষ্টি করতে থাকে। ক্রমশঃ এই 'আমার আমার'

গণ্ডীর সংকীর্ণতাও দূর হয়ে যায়। 'আমার'-এর গণ্ডী বিকশিত হতে হতে সাম্যের পূর্ণতা প্রাপ্ত হওয়ার পরে অসীম হয়ে যায়।

মানুষ যতদিন পর্য্যন্ত 'আমি'র সংকীর্ণতায় আবদ্ধ থাকে, ততদিন এই 'আমি'র জন্য কারও ক্ষতি করতেও সে দ্বিধা করে না। পরিধি একটু বিস্তৃত হলে যেগুলোকে 'আমার' 'আমার' বলে সেগুলোর ক্ষতি সাধন থেকে সে নিবৃত্ত হয়। 'আমি'র গণ্ডী থেকে বেরিয়ে আসতে পারলে 'আমার'-এর সংকীর্ণ গণ্ডীও সীমিত হয়ে যায় 'আমার স্ত্রী', 'আমার পুত্র' এই গণ্ডী পর্যন্ত। আরও আগে এগিয়ে যেতে পারলে 'আমার কুল', 'আমার গোত্র', 'আমার বর্ণ', 'আমার জাতি', 'আমার সম্প্রদায়', 'আমার প্রদেশ', 'আমার রাষ্ট্র'-এর পরিধিতে আটকে থাকে। সমতাধর্মে পরিপুষ্ট হতে পারলে ঐ পরিধির গণ্ডীও ছিন্ন হয়। কেবল মানবমাত্র নহে, প্রাণিমাত্রেরই হিতসুখে নিজের হিতসুখ দেখতে থাকে। কোনও প্রাণীর হিতসুখ নষ্ট করে নিজের হিতসুখের কুচেষ্টা করা তো দূরের কথা, সেরূপ চিন্তাও মনে স্থান দিতে পারে না।

যেখানেই গণ্ডী সেখানেই বিষমতা। গণ্ডী যতই সংকীর্ণ হবে বিষমতা ততই তীব্র হবে। সাম্যেরও ততখানি অভাব হবে। সাম্যের অভাবের জন্যই যা 'আমি' এবং 'আমার'—তার হিতসুখের এবং সুরক্ষার জন্য যা 'আমি' নহে এবং যে 'আমার' নহে তার হানি করতেও মানুষ দ্বিধা করে না। যতক্ষণ মনোভাব এইরূপ থাকবে ততক্ষণ জীবন পাপেই পরিপূর্ণ থাকে। যেটা 'আমি-আমার', তার জন্য 'এক কণাও' জোটাতে পারলে যেটা 'আমি-আমার' নয় তার 'এক মনও' মাটিতে মিলিয়ে দিতে মানুষ দ্বিধা করে না। 'আমি আমার' এর জন্য কোন দুর্বলের মুখের গ্রাসও কেড়ে নিতে ইতস্তত করে না। এই 'আমি আমার'-এর অন্ধতায় জঘন্যতম পাপকর্মও করা অনুচিত বলে মানুষের মনে হয় না।

বিষমতা 'আমি আমার', অহং মমং ভাবের জননী। 'আমি-আমার' ভাব বিষমতাকে পুষ্ট করে। 'আমি আমার' ভাবের জন্যই আমরা তীব্র লোভের বশীভূত হয়ে সংগ্রহ-পরিগ্রহে লিপ্ত হই, অন্য অনেককে

অভাবগ্রস্ত করে সামাজিক সমতাকে হত্যা করি। তীব্র দম্ভের বশীভূত হয়ে উচ্চ কুল, উচ্চ বর্ণ এবং উচ্চ জাতির অহংকার মাথায় চাপিয়ে থাকি এবং সমাজে উঁচু নীচুর ভেদভাব উৎপন্ন করে সামাজিক সমতাকে হত্যা করি। ক্ষমতার মদে মাতাল হয়ে দুর্বল এবং সরল মানুষকে দমন এবং শোষণ করতে থাকি এবং সামাজিক সমতাকে হত্যা করি। এইভাবে আর্থিক, সামাজিক, রাজনৈতিক প্রভৃতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিজের 'অহং'কে পোষণ করতে গিয়ে বৈষম্য সৃষ্টি করি। অন্যদের সমান অধিকারকে পদদলিত করে নির্মম পৈশাচিক ব্যবহার করি এবং নিজের তথা অন্য সকলের দুঃখের কারণ হয়ে থাকি। এর সবই সমতার অভাবের কারণেই হয়ে থাকে। নিজ-পরের ভেদ মিটিয়ে সাম্যভাব মনে আনতে পারলেই এইরূপ নৃশংসতা আর আমরা করতেই পারবো না। কোন ভেজাল ওষুধের কারবারীও নিজের রোগগ্রস্ত পুত্রকে কখনও সে ওষুধ খেতে দেয় না। আপন-পর ভেদাভেদ দূর করতে পারলে কখনও কাউকেই আমরা ভেজাল ওষুধ খেতে দেব না। যদি আমি ঘুষখোর শাসক বা শাসনাধিকারী হই, তাহলেও নিজের ছেলের কাছ থেকে কখনও ঘুষ নেব না। আপন-পর ভেদ দূর হলে কখনও অন্য কারও কাছ থেকেও ঘুষ নেব না। যদি আমি উচ্চবর্ণের মিথ্যা দম্ভের শিকার হয়ে থাকি, তাহলেও কখনও নিজের ছেলেকে অচ্ছুত বলে দূরে সরিয়ে দেবো না। আপন-পর ভেদ দূর হলে কাউকেই অচ্ছুত বলে প্রত্যাখ্যান করবো না। আপন-পরের ভেদ দূর হওয়াই হচ্ছে বৈষম্য দূর হওয়া এবং সর্বমঙ্গলকারী সাম্যভাবের প্রতিষ্ঠা হওয়া।

যেখানে শুদ্ধ সাম্যভাব প্রতিষ্ঠিত হয়, সেখানে আপন-পরের সীমাবন্ধন ছিন্ন হয়। পরিণামে শোষণ বন্ধ হয়, সহযোগিতা আসে। ক্রূরতা বন্ধ হয়, মৃদুতা আসে। অন্যায় বন্ধ হয়, ন্যায় আসে। সংকীর্ণতা বন্ধ হয়, উদারতা আসে। অহংভাব-হীনভাব বন্ধ হয়, ভ্রাতৃভাব আসে। অধর্ম বন্ধ হয়, ধর্ম আসে।

একটা দিক হচ্ছে ঃ নিজের মিথ্যা স্বার্থ সমূহের সুরক্ষার জন্য ভীত এবং আতঙ্কিত হয়ে কোন দুর্বল ব্যক্তিকে কনুই দিয়ে ধাক্কা মেরে নীচে ফেলে পায়ের তলায় পিষ্ঠ করার ক্রূরতা। আর একটা দিক হচ্ছে ঃ যোগ ক্ষেমের দ্বারা পরিপূর্ণ হয়ে নির্ভয়ে থেকে সকলের হিতসুখের মধ্যেই নিজের হিতসুখ দেখার বিশাল-হৃদয়তা। এই দুই দিকের মাঝখানের যাবতীয় স্থিতি সমতা ধর্ম বিকাশেরই সোপান।

সমতা পুষ্ট হলে সামঞ্জস্য আসে, সমন্বয় আসে, স্নেহ-সৌহার্দ্য আসে, সহিষ্ণুতা আসে। সহযোগ, সদ্‌ভাব এবং সহযোগিতা সহজ ভাবেই আসে। এগুলোর জন্য প্রযত্ন করতে হয় না। এ সব না আসতে থাকলে বুঝতে হবে আমরা অনেক পিছিয়ে আছি। এখনও জীবনে যথার্থ বিপশ্যনা, যথার্থ সমতা আসেনি। সমতার সাধনার নামে কোন ছলনা কোন মায়া বা কোন ধোঁকা এসে থাকবে। দার্শনিক বুদ্ধিবিলাসের কোন এক চমৎকার আবরণ এসে থাকবে। অবশ্যই অন্তর্মন এখনও বিষমতায় পূর্ণ আছে। নিজে নিজেকে এভাবে মানদণ্ডে ফেলে বিচার করতে হবে।

বাস্তবিক, সমতা পুষ্ট হলে নিজের ক্ষতি স্বীকার করেও আমরা অন্যের হিতসাধন করবো এবং সেটা সহজ ভাবেই করতে পারবো। দীপের বাতি নিজে জ্বলে অন্যদের আলোকিত করে। ধূপবাতি নিজে জ্বলে অন্যদের সুবাসিত করে। চন্দনকাঠ নিজে চূর্ণ হয়ে অন্যদের সুরভি প্রদান করে। ফলবান বৃক্ষ ঢিলের আঘাত সহ্য করে সকলকে ফল দান করে। এবং এ সবকিছুই সহজভাবেই হয়ে থাকে। সমতা সহজ হয়ে গেলে সকলেরই মঙ্গলের স্রোত উন্মুক্ত হবে।

এইরূপ সর্বমঙ্গলময় সমতাধর্মে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য অভ্যাস করুন।

ছায়ে সমতা সুখময়ী

সুখ-দুখ দোনো এক সে, মান অউর অপমান।
চিত্ত বিচলিত হোয় নহীঁ, তো সচ্চা কল্যাণ।।

জীবন মেঁ আতে রহেঁ, পতঝড় অউর বসন্ত।
মন কী সমতা না ছুটে, তো সুখ-শান্তি অনন্ত।।

জ্যুঁ জ্যুঁ অন্তর্জগত মেঁ, নির্মল সমতা ছায়।
কায়া বাণী চিত্ত কে, কর্ম সুধরতে জায়ঁ।।

তন সুখ, মন সুখ, মান সুখ, ভলে ধ্যান সুখ হোয়।
পর সমতা সুখ পরম সুখ, অতুল অপরিমিত হোয়।।

বিষম জগত মেঁ চিত্ত কী, সমতা রহে অটুট।
তো উত্তম মঙ্গল জগে, হোয় দুখোঁ সে ছুট।।

শুদ্ধ ধর্ম জগ মেঁ জগে, হোয় বিষমতা দূর।
ছায় সমতা সুখময়ী, যোগ ক্ষেম ভরপুর।।

৯

সরল চিত্ত

সরলতাই চিত্তের বিশুদ্ধি। কুটিলতা হচ্ছে মলিনতা। মলিনতা অনর্থকারী, বিশুদ্ধতা সর্ব-হিত-সাধক। কুটিলতা সর্ব-হিত-নাশক, সরলতা সর্ব-হিত-কারক। শুধু নিজের নয়, সকলের হিত-সুখ সাধনের জন্য সরলতার আশ্রয় নিন, কুটিলতা ত্যাগ করুন।

নৈসর্গিক স্বচ্ছ মন স্বভাবতই সরল হয়। সরলতা চলে গেলে বুঝতে হবে স্বচ্ছতাও চলে গেছে। সরলতা হারাবার তিনটি কারণ আছে যার থেকে আমাদের সাবধানতার সঙ্গে বাঁচতে হবে। কোন্ তিনটি? তৃষ্ণা, অহংকার এবং দার্শনিক মতবাদ। 'তণ্হা-মান-দিট্‌ঠি'—এই তিনটির মধ্যে যে কোন একটার প্রতি যত আসক্তি উৎপন্ন হয়, আমরা ততখানি সরলতা হারিয়ে বসি, ততখানি স্বচ্ছতা বিনষ্ট করি। আমরা ততটা মলিন হয়ে যাই, সুখ শান্তিবিহীন হয়ে যাই এবং ততটা দুঃখী হয়ে পড়ি।

যখন কোন বস্তু, ব্যক্তি বা স্থিতির প্রতি তৃষ্ণা জাগে এবং আসক্তি বাড়ে, তখন তাকে পাওয়ার জন্য এবং পেলে নিজের অধিকারে রাখার জন্য আমরা নিকৃষ্টতম পন্থা পর্যন্ত অবলম্বন করতে দ্বিধা করি না। চুরি, ডাকাতি, মিথ্যা-প্রতারণা, ছল-চাতুরী, প্রপঞ্চ-প্রবঞ্চনা, ধোঁকা-ধড়িবাজী ইত্যাদি সবকিছুর আশ্রয় নিয়ে থাকি। নিজের পাগলামিতে মনের সমস্ত সরলতা হারিয়ে ফেলি। নিজের লক্ষ্যকে পাওয়ার তীব্র ইচ্ছায় সাধনের পবিত্রতা হারিয়ে ফেলি। প্রিয়ের প্রতি আসক্তিই অপ্রিয়ের প্রতি বিরোধ উৎপন্ন করে। এতে আমরা এতই প্রমত্ত হয়ে উঠি যে তৃষ্ণা-পূরণে যত বাধাই থাকুক না কেন তাকে দূর করার জন্য, নষ্ট করার জন্য সীমাহীন

ক্রোধ, রোষ, দ্বেষ, মোহ, দৌর্মনস্য এবং দুর্ভাবনা সৃষ্টি করি এবং তার পরিণামস্বরূপ নিজের সুখশান্তি নষ্ট করি। মনের সরলতা নষ্ট করে ফেলি।

এইভাবে যখন 'আমি আমার'-এর প্রতি আসক্তি বাড়ে, তখন ঐ মিথ্যা কল্পিত 'আমি আমার'-এর মিথ্যা সুরক্ষা এবং হিতসুখের জন্য যাদের 'আমি-আমার' বলে মানি না তাদের অতি বৃহৎ ক্ষতিসাধনও করি। এরূপ করতে গিয়ে বস্তুতপক্ষে নিজেরই অধিক ক্ষতি সাধন করি। নিজের মনের সরলতাকে হত্যা করি, নিজের অন্তরের স্বচ্ছতা হারিয়ে ফেলি, নিজের সুখশান্তি বিনষ্ট করি। অন্যদের ঠকাতে গিয়ে নিজেই ঠকে যাই।

সেই রকম যখন কোন দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী অথবা সাম্প্রদায়িক বিশ্বাসের প্রতি আমাদের আসক্তি হয়, তখন আমরা সংকীর্ণতার শিকার হয়ে পড়ি এবং মনের সহজ সরলতা হারিয়ে ফেলি। মন যখন জলের ন্যায় সহজ-সরল-তরল হয়, তখন নিজেই নিজেকে সত্যের পাত্রের অনুকূল করে নেয় এবং নিজের সরলতাও নষ্ট করে না। পথে বাধা এলে কলকল স্বরে তার পাশ দিয়ে বেরিয়ে যায়। কোন বাধা তাকে দ্বিধাবিভক্ত করলেও কিছুটা এগিয়ে গিয়ে সে আবার জুড়ে যায়। যেমন ছিল ঠিক তেমন রূপ ধারণ করে। যদি কোন অবরোধ প্রাচীরের মতো সামনে এসে গতিরোধ করে, তাহলে ধৈর্যপূর্বক ধীরে ধীরে উঁচুতে উঠে প্রাচীর অতিক্রম করে সহজ ভাবেই আগে এগিয়ে যায়। কিন্তু যখন মন পাথরের মতো কঠোর হয়, তখন পরস্পর ঠোক্কর খেয়ে স্ফুলিঙ্গ উৎপন্ন করে চূর্ণবিচূর্ণ হয়। যখন আমাদের দৃষ্টি দার্শনিক বিশ্বাস, অন্ধবিশ্বাস, কর্মকাণ্ড এবং বাহ্য আড়ম্বরের প্রতি আসক্ত হয়ে রূঢ় হয়ে যায়, তখন পাথরের মতো হয়ে যায়। এই পাথুরে দৃষ্টি নির্জীব হয়ে যায়, আমাদের অন্ধ করে দেয় এবং আমাদের কল্যাণের রাস্তা বন্ধ করে দেয়। সাম্প্রদায়িকতার দাসত্বে জড়িয়ে থাকার ফলে আমরা 'সত্য'কে নিজের চশমায় দেখতে চাই। তাকে ভেঙেচুরে নিজের মনের মতো বানাতে চাই এবং তার উপর রং-টং চাপিয়ে তার সহজ স্বাভাবিকতা, সহজ সৌন্দর্য নষ্ট করে ফেলি। এই অপপ্রয়াসে নিজের মনের সরলতা নষ্ট করে ফেলি। মনকে কুটিলতায় পূর্ণ করি।

কুটিলতা হচ্ছে কঠোরতা, সরলতা হচ্ছে মৃদুতা। কুটিলতা হচ্ছে অভিমান, সরলতা হচ্ছে নিরভিমান। কুটিলতা হচ্ছে গ্রন্থিবন্ধন, সরলতা হচ্ছে গ্রন্থিবিমোচন।

গ্রন্থিবন্ধন বড়ই দুঃখদায়ী। প্রকৃত সুখ তো গ্রন্থিবিমোচনের মধ্যেই, বিমুক্তির মধ্যেই। যখনই সরলতা হারিয়ে কুটিলতার শিকার হয়ে পড়ি, তখনই নিজের মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলি। ভেতরে ভেতরে উত্তেজনা শুরু হয়ে যায়। অজ্ঞাতসারেই গ্রন্থিবন্ধন শুরু হয়ে যায়। অন্তর্মন জটিল হয়ে যায়। তার সাথে সাথে শরীরের শিরা-উপশিরা মুঞ্জের দড়ির মতো শক্ত হয়ে যায়। এতে আমরা চঞ্চল, অশান্ত এবং ব্যাকুল হয়ে পড়ি। আমাদের এই আন্তরিক ব্যাকুলতা উত্তেজনার রূপ নিয়ে বাইরে প্রকট হয় এবং এইভাবে আমরা নিজেদের অশান্তি অন্যদের উপর বর্ষণ করতে শুরু করি।

এর বিপরীতে মন যখন সহজ-সরল থাকে, তখন মৃদু-মধুর, সৌম্য-স্বচ্ছ, শীতল-শান্ত থাকে। শরীরও হাল্কা এবং পুলক-রোমাঞ্চে পূর্ণ থাকে। পরিণামে আমরা প্রীতি-প্রমোদ এবং সুখ-সৌহার্দ্যে পূর্ণ হয়ে উঠি। আমাদের এই আন্তরিক প্রীতি-সুখ মৈত্রী এবং করুণার রূপে বাইরে প্রকট হয় এবং এইভাবে আমরা নিজের সুখশান্তি অন্যদেরও বন্টন করতে থাকি। আশেপাশের গোটা বায়ুমণ্ডলকে প্রসন্নতায় ভরপুর করি।

অতএব, আত্মহিত পরহিত এবং সর্বহিতের জন্য কুটিলতা ত্যাগ করুন, সরলতা আয়ত্ত করুন।

কুটিলতায় মহা অমঙ্গল নিহিত আছে, সরলতায় নিহিত আছে মহামঙ্গল।

কথনী করনী এক সী

যো চাহে অপনা কুশল, যো চাহে নির্বাণ।
সরল, সরল অতি সরল বন, ছোড় কপট অভিমান।।

যব তক মনমে কুটিলতা, মুক্ত হুয়া না কোয়।
জিসনে ত্যাগী কুটিলতা, সহজ মুক্ত হ্যয় সোয়।।

অপনে মন কী কুটিলতা, অপনা হী দুখ ভার।
অপনে মন কী সরলতা, অপনা হী সুখ সার।।

কপট রহে না কুটিলতা, রহে ন মিথ্যাচার।
শুদ্ধ ধর্ম অ্যয়সা জগে, হোয় স্বচ্ছ ব্যবহার।।

সহজ সরল মৃদু নীর-সা, মন নির্মল হো জায়।
ত্যাগে কুলিশ কঠোরতা, গাঁঠ ন বঁধনে পায়।।

বাহর ভীতর এক রস, সরল স্বচ্ছ ব্যবহার।।
কথনী করনী এক-সী, এহী ধরম কা সার।।

১০

ধর্মের সর্বহিতকারী স্বরূপ

মনুষ্য সামাজিক প্রাণী। সমাজ থেকে আলাদা থাকা তার পক্ষে উচিতও নয়, সম্ভবও নয়। সমাজে থেকেই সমাজের জন্য অধিকতর সুস্থ সহায়ক হতে হবে, এতেই মনুষ্যজীবনের উপযোগিতা এবং সার্থকতা। সুস্থ ব্যক্তিদের দ্বারাই সুস্থ সমাজের গঠন সম্ভব। অসুস্থ ব্যক্তি হচ্ছেন তিনি যাঁর মন বিকার দ্বারা বিকৃত থাকে। এইরূপ ব্যক্তি নিজে তো দুঃখী থাকেই, উপরন্তু নিজের সংস্পর্শে আসা মানষকে উত্তপ্ত করে। অতএব সুখী ও সুস্থ সমাজ তৈরী করার জন্য প্রত্যেক ব্যক্তিকেই সুখ ও স্বাস্থ্যের দ্বারা ভরপুর করা নিতান্ত আবশ্যক। প্রত্যেক ব্যক্তির চিত্ত যদি স্বচ্ছ হয়, শান্ত হয়, তাহলে সমগ্র সমাজের শান্তি বজায় থাকে। ধর্ম এই ব্যক্তিগত শান্তির জন্য এক অনুপম সাধন এবং সেজন্য বিশ্বশান্তিরও একমাত্র সাধন।

'ধর্ম' শব্দের অর্থ সম্প্রদায় নয়। সম্প্রদায় মানুষের মধ্যে এবং গোষ্ঠীর মধ্যে বিভেদের প্রাচীর সৃষ্টি করে। কিন্তু শুদ্ধ ধর্ম এই প্রাচীর ভেঙ্গে দেয়, বিভেদ দূর করে।

শুদ্ধ ধর্ম মানুষের ভেতরের সুপ্ত অহংভাব এবং হীনভাবকে সমূলে উৎপাটিত করে। মানুষের মনের আশংকা, উত্তেজনা, উদ্বেগ দূর করে এবং তাকে (মনকে) স্বচ্ছতা ও নির্মলতার সেই ধরাতলে প্রতিষ্ঠিত করে যেখানে অহংকারজাত দম্ভ টিকতে পারে না এবং হীনভাবের গ্রন্থির দ্বারা গ্রস্ত দৈন্য বাড়তে পারে না। জীবনে সমতা আসে এবং প্রত্যেক বস্তু, ব্যক্তি এবং স্থিতিকে তার যথার্থ স্বরূপে দেখার নির্মল প্রজ্ঞা জাগে। অতিরঞ্জন এবং অতিশয়োক্তিতে নিমজ্জিত ভক্তি-ভাবাবেশ দূর হয়। জ্ঞান, বিবেক, বোধির অন্তর্চক্ষু বিরজঃ এবং বিমল হয়ে যায়।

অন্তর্দৃষ্টি পারদর্শিতা লাভ করে। তার সামনে থেকে সমস্ত কুয়াশা, সমস্ত অন্ধকার দূর হয়ে যায়। এই যে আমরা শোনা কথা বা পড়া কথার দ্বারা আমাদের মনকে বিকৃত করে ফেলেছি, এই পূর্ব-গৃহীত বিকৃতিগুলো সত্যদর্শনে বাধা সৃষ্টি করে। পূর্বনিশ্চিত ধারণা এবং বিশ্বাসগুলো আমাদের চোখের উপর রঙীন চশমার মতো লেগে থাকে এবং বাস্তব সত্যকে সেই রঙে দেখার জন্যই আমাদের বাধ্য করে। ধর্মের নামে আমরা এই শৃঙ্খলকেই সুন্দর অলংকারের মতো পরিধান করে আছি। বাস্তবিক মুক্তির জন্য এই শৃঙ্খলকে ছিন্ন করা নিতান্ত আবশ্যক।

চিত্তকে আসক্তি, বিদ্বেষ, মোহ, ঈর্ষা, মাৎসর্য, দুর্ভাবনা, দৌর্মনস্য, ভয়, আশংকা, মিথ্যা কাল্পনিক দৃষ্টি, বিশ্বাস ও কুসংস্কারের বন্ধন থেকে মুক্ত করার জন্য আবশ্যক হচ্ছে—সমস্ত কুসংস্কারের পরম্পরাকে এক দিকে সরিয়ে দিয়ে, ভাবুকতাকে দূরে সরিয়ে, যথার্থ ভাবে বাঁচতে শেখা। যথার্থ ভাবে বাঁচা হচ্ছে বর্তমানে বাঁচা, এই মুহূর্তে বাঁচা। কারণ অতীত ক্ষণ যথার্থ নয়, সেটা তো সমাপ্ত হয়ে গেছে। এখন তো কেবল তাকে মনে পড়তে পারে, কিন্তু সেই মুহূর্তটা তো আর নেই! সেই যে মুহূর্ত ভবিষ্যতে আসবে, এখনও আসেনি, তারও কেবল কল্পনা এবং কামনাই হতে পারে, যথার্থ দর্শন নয়। বর্তমানে বাঁচার অর্থ—এই মুহূর্তে যা কিছু অনুভূত হচ্ছে তারই প্রতি সজাগ থেকে বাঁচা। অতীতের সুখদ বা দুঃখদ স্মৃতি অথবা ভবিষ্যতের সুখদ বা দুঃখদ আশা ও আশঙ্কা আমাদের বর্তমান থেকে অনেক দূরে নিয়ে যায় এবং এইভাবে আমাদের বাস্তব জীবন থেকে সরিয়ে রাখে। বর্তমান থেকে বিমুখ এইরূপ অসার জীবনই আমাদের বিভিন্ন ক্লেশের কারণ হয়ে থাকে। অশান্তি, অসন্তোষ, অতৃপ্তি, আকুলতা, ব্যথা এবং পীড়ার জন্ম দেয়। যখন আমরা বর্তমান মুহূর্তটিকে তার স্বরূপ অনুসারে দর্শন করতে করতে জীবন যাপন শুরু করি, তখন ক্লেশ থেকেও স্বাভাবিক মুক্তি লাভ করতে থাকি।

এই দেশের এক মহাপুরুষ 'ভগবান' তথাগত গৌতম বুদ্ধের এই সম্যক্ সম্বোধি প্রাপ্তি হয়েছিল। এই মুহূর্তে যথার্থভাবে বাঁচতে শিখে

চিত্তকে সংস্কার থেকে মুক্ত করে, পরম পরিশুদ্ধ করে, সর্ববন্ধনমুক্ত হওয়ার মার্গ তাঁর জানা হয়েছিল। তিনি আজীবন মানুষকে এই কল্যাণকারী ধর্ম অভ্যাস করিয়েছেন। এই মঙ্গলময় বিধিরই নাম বিপশ্যনা সাধনা। সাধক বর্তমান মুহূর্তে যা কিছু অনুভব করবেন তারই প্রতি সজাগ থাকার অভ্যাস করবেন। নিজের শরীরের প্রতি সজাগ থেকে **কায়ানুপশ্যনা** করবেন। শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে অনুভূত সমস্ত সুখদ-দুঃখদ অথবা অসুখদ-অদুঃখদ সংবেদনা প্রতি সজাগ থেকে **বেদনানুপশ্যনা** করবেন। নিজের চিত্তের প্রতি সজাগ থেকে **চিত্তানুপশ্যনা** করবেন। চিত্তে উৎপন্ন বিভিন্ন ভাল-মন্দ বৃত্তি প্রতি এবং সেগুলোর গুণ, ধর্ম, স্বভাবের প্রতি সজাগ থেকে এবং পরিশেষে কায়া, সংবেদনা, চিত্ত ও চিত্তবৃত্তির পরিসীমার ওপারে নির্বাণধর্মের সাক্ষাৎ করে **ধর্মানুপশ্যনা** করেবেন। সজাগ থাকার এই অভ্যাস সাধকের চিত্তে উৎপন্ন সমস্ত অকুশল বিকার ও সংস্কারকে উচ্ছেদ করে। চিত্ত ধীরে ধীরে আসক্তি, আস্রব, ব্যসন, তৃষ্ণা এবং তীব্র লালসার বন্ধন থেকে, অতীতের সুখদ দুঃখদ স্মৃতির নিরর্থক রোমন্থন থেকে, ভাবী আশংকার ভয়-ভীতির জন্য মানসিক উৎপীড়ন থেকে, ভবিষ্যতের রঙীন স্বপ্নের কাল্পনিক বিচার থেকে মুক্ত হয়ে, নিজের স্বাভাবিক নৈসর্গিক স্বচ্ছতা লাভ করে।

সমস্ত পীড়াদায়ক গ্রন্থি এবং উদ্বেগ-উত্তেজনাপূর্ণ মানসিক পীড়াকে দূর করার এটা একটা সহজ সরল উপায় যা যে কোনও মানুষের জন্য সমানভাবে কল্যাণকারী। এর অভ্যাস করার জন্য এটা অনিবার্য নয় যে সাধককে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ে দীক্ষিত হতে হবে। এটাও অনিবার্য নয় যে, এই বিধির প্রবর্তক 'ভগবান' বুদ্ধের মূর্তিকে প্রণাম করতে হবে। তাঁকে ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য এবং আরতির দ্বারা পূজা করতে হবে। এটারও প্রয়োজন নেই যে, সাধক সেই আদি গুরুর রূপ বা আকারের ধ্যান করবেন অথবা তাঁর নাম বা মন্ত্রের জপ করবেন। এটাও নয় যে, তাঁর শরণ গ্রহণ করার নামে অন্ধভাবে তাঁতে আত্মসমর্পণ করবেন—নিজে কিছু না করে কেবল তাঁরই কৃপাতে 'তরে যাব' এইরূপ ভ্রান্তি যেন মাথায় চেপে না

বসে। তবে এই বিধির দ্বারা স্বয়ং লাভবান হয়ে অথবা অন্যদের লাভবান হতে দেখে যদি কোন সাধক সেই মহাকারুণিক মহাপ্রজ্ঞাবান 'ভগবান' তথাগতের প্রতি কৃতজ্ঞতা-বিভোর হয়ে তাঁর করুণা এবং প্রজ্ঞার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন তো কোন দোষ নেই। গুণের প্রতি শ্রদ্ধা ঐ গুণকে নিজের জীবনে ধারণ করার প্রেরণা দেয়। অতএব সেই শ্রদ্ধা কল্যাণকারী। এইরূপ কৃতজ্ঞতাও চিত্তের এক মঙ্গলময়ী সদ্‌বৃত্তি। শ্রদ্ধা এবং কৃতজ্ঞতার ভাবনা চিত্তকে মৃদু করে যা বিপশ্যনা সাধনার এই চিত্তবিশুদ্ধির প্রয়াসে সহায়ক হয়।

বিপশ্যনা সাধনা কায়া এবং চিত্তের প্রকৃতির যথার্থ স্বরূপের প্রতি সজাগ থাকতে শিক্ষা দেয়। প্রকৃতির যথার্থ স্বরূপ দর্শনের এই অভ্যাস কোন বর্গ, সম্প্রদায়, জাতি, দেশ, কাল বা বিভিন্ন ভাষাভাষী ব্যক্তির জন্য কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে না। মানব নিজের প্রকৃতিকে নিজেই অধ্যয়ন করে। আত্মদর্শন করে। আত্ম-নিরীক্ষণ করে। নিজের অভ্যন্তরের মালিন্যকে যথাভূত দর্শন করে। নিজের মনোবিকারকে যথার্থ অবলোকন করে। এইভাবে দর্শন করতে করতে সমস্ত মনোবিকার দূর হয়ে যায়, এবং সাধক 'উত্তম মানব' হয়ে প্রকৃত মানবীয় ধর্মে প্রতিষ্ঠিত হয়। এইরূপ উত্তম মানব যে কোন জাতি বর্গ বা সম্প্রদায়েরই হোন না কেন, তিনি সমগ্র মানব সমাজের গৌরব। স্বয়ং তো সুখ-শান্তিতে থাকেনই, তাঁর সংস্পর্শে আগত অন্য সকলের সুখ-শান্তি বৃদ্ধির পথেও সহায়ক হন।

সদ্ধর্মের এই সর্বজনীন, সার্বদেশিক, সার্বকালিক এবং সর্বহিতকারী স্বরূপ আরও অধিক মাত্রায় মানুষ উপলব্ধি করুন এবং তা তাঁদের হিত-সুখের কারণ হোক — এটাই মঙ্গল কামনা।

ধর্ম সিখাএ প্যার

সম্প্রদায় ন ধর্ম হ্যয়, ধর্ম ন বনে দিওয়ার।
ধর্ম সিখাএ একতা, ধর্ম সিখাএ প্যার।।

শুদ্ধ ধর্ম জাগে জহাঁ, হোয় সভী কা শ্রেয়।
নিজ হিত, পর হিত সর্বহিত, য়হী ধর্ম কা ধ্যেয়।।

ধর্মবান কী জিন্দগী, সবকে সুখ হিত হোয়।
অপনা ভী হোয় ভলা, ভলা সভী কা হোয়।।

ধর্ম-বিহারী পুরুষ হোঁ, ধর্ম-চারিণী নার।
ধর্মবন্ত সন্তান হোঁ, সুখী হোয় সংসার।।

বীতে ক্ষণ মেঁ জী রহে, য়া জো আয়া নাঁয়।
ইস ক্ষণ মেঁ জীএ অগর, তো জিনা আ জায়।।

পল-পল ক্ষণ-ক্ষণ সজগ রহ, অপনে কর্ম সুধার।
সুখ সে জীনে কী কলা, অপনী ওর নিহার।।

১১
ধর্মই রক্ষক

নিজের ভবিষ্যতের সুরক্ষার জন্য চিন্তিত থাকা মানুষের মনের স্বভাব হয়ে গেছে। আগামী মুহূর্ত সুখদ হোক, যোগক্ষেমের দ্বারা পরিপূর্ণ হোক — এইজন্য মানব নানারকম শরণ খোঁজে, আশ্রয় সন্ধান করে, অবলম্বন চায়। কিন্তু ধর্মকে বাদ দিয়ে কোন শরণ, আশ্রয় বা অবলম্বন নেই—ধর্মই মানুষকে ভবিষ্যতের প্রতি নিঃশঙ্ক ও নির্ভয় করে, যোগক্ষেমের দ্বারা পরিপূর্ণ করে। অতএব ধর্মের শরণই একমাত্র শরণ। ধর্মের সংরক্ষণই যথার্থ সংরক্ষণ। ধর্ম হচ্ছে তাহাই যা আমাদের মনে জাগে এবং যাকে আমরা স্বয়ং ধারণ করি। অন্য কারও ভেতরে যে ধর্ম জেগেছে, অন্য কেউ যাকে ধারণ করেছেন সেই ধর্ম আমাদের কোন্ কাজে আসবে? সেটা কেবল আমাদের অধিকতর প্রেরণা এবং বিধি প্রদান করতে পারে। কিন্তু আমাদের বাস্তবিক লাভ তো নিজে ধর্ম ধারণ করার মধ্যেই। অতএব ধর্মশরণের যথার্থ অভিপ্রায় হচ্ছে আত্মশরণ। সেইজন্য বলা হয়েছে—**অত্তসম্মাপণিধি চ এতং মঙ্গলমুত্তমং,** অর্থাৎ আমাদের উত্তম মঙ্গল এই কথার মধ্যে নিহিত যে আমাদের সম্যক্ প্রকার আত্মপ্রণিধানের অভ্যাস করতে হবে। কোনও বাহ্যশক্তির প্রণিধানের অভ্যাস আমাদের ভীত, পরাশ্রয়ী এবং অসমর্থ করে দেয়। ধর্মদ্বীপ এবং ধর্মশরণ হ'ল প্রকৃতপক্ষে আত্মদ্বীপ ও আত্মশরণ। যে কোন সংকটে আমাদের ভেতরের ধর্মকে জাগাতে হবে। স্বয়ং ধারণ করা ধর্মের দ্বারা এমন এক সুরক্ষিত দ্বীপ আমরা বানাতে পারি যাতে আমাদের জীবনের দোদুল্যমান নৌকা যথার্থ আশ্রয় পেতে পারে, যে কোন বিপদ-আপদে আমাদের সুরক্ষা নিশ্চিত হতে পারে।

আসল কথা হচ্ছে এই যে, আমাদের নিজের ভেতরের প্রজ্ঞাকে জাগিয়ে রাখতে হবে এবং এইজন্য সমাধির দ্বারা নিজের চিত্তের একাগ্রতাকে পুষ্ট

রাখতে হবে; কায়িক ও বাচিক দুষ্কর্ম থেকে নিবৃত্ত হয়ে নিজের শীল অখণ্ডিত রাখতে হবে। শীল, সমাধি এবং প্রজ্ঞার এই বিশুদ্ধ ধর্ম আমরা যতটা সুরক্ষিত রাখবো অর্থাৎ আমরা যতটা ধর্মবিহারী হতে পারবো, স্বয়ং পালন করা, স্বয়ং ধারণ করা, স্বয়ং সুরক্ষিত করা ধর্মের দ্বারা ততটা নিজের সুরক্ষণ ও সংরক্ষণ লাভ করবো। বাস্তবিক **"ধম্মো হউয়ে রক্খতি ধম্মচারিং"**— ধর্মচারীর রক্ষা স্বয়ং ধর্মই করে। তাহলে নিজের যথার্থ সুরক্ষার জন্য স্বয়ং প্রকৃত ধর্মচারী ধর্মবিহারী এবং ধর্মপালক হোন। এতেই আমাদের মঙ্গল এবং কল্যাণ নিহিত আছে।

ধর্ম সদা হী সাথ

ধর্ম সদৃশ না কবচ হ্যয়, ধর্ম সদৃশ না ঢাল।
ধর্ম-পালকোঁ কী সদা, ধর্ম করে প্রতিপাল।।

প্রলয়ংকারী বাঢ় মেঁ, ধর্ম সদৃশ না দ্বীপ।
কাল-অঁধেরী রাত মেঁ, ধর্ম সদৃশ না দীপ।।

ধর্ম সদৃশ রক্ষক নহীঁ, সখা, সহায়ক, মীত।
চলেঁ ধর্ম কে পন্থ পর, রহে ধর্ম সে প্রীত।।

জীবন মেঁ ঝঞ্ঝা উঠে, উঠে তেজ তুফান।
শরণ গ্রহণ কর ধর্ম কী, ধর্ম বড়া বলবান।।

ভলে জগত প্রতিকূল হো, কোই মিত্র ন হোয়।
ধর্ম সতত জাগ্রত রহে, তো মঙ্গল হী হোয়।।

ধর্ম হমারা ঈশ হ্যয়, ধর্ম হমারা নাথ।
হমকো ভয় কিস বাত কা? ধর্ম সদা হী সাথ।।

১২
নাম-এ কি আছে?

অতীতের কথা। কোন ব্যক্তির মা-বাবা তার নাম রেখেছিলেন ‘পাপক’(পাপী)। সে যখন বড় হোল, তখন ঐ নামটা তার ভীষণ খারাপ লাগতে লাগল। সে আচার্যের কাছে প্রার্থনা করল—ভন্তে, আমার নামটা বদলে দিন। এই নাম খুব অপ্রিয়, কারণ এটা অশুভ, অমাঙ্গলিক এবং দুর্ভাগ্যসূচক। আচার্য তাঁকে বোঝালেন—দেখ, নাম হচ্ছে একটা সম্বোধন মাত্র। ব্যবহারিক জগতে কাউকে ডাকার জন্য এই নামের প্রয়োজন। নাম পাল্টালে কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না। কারও নাম ‘পাপক’ থাকলেও সৎকর্মের দ্বারা সে ‘ধার্মিক’ হতে পারে। আবার কারও নাম ‘ধার্মিক’ থাকলেও দুষ্কর্মের ফলে সে ‘পাপক’ (পাপী) হতে পারে। আসল কথা হচ্ছে কর্মের। নাম পাল্টালে কি হবে?

কিন্তু সে কিছুতেই শুনল না। বারবার আচার্যকে অনুরোধ করতে লাগল। আচার্য তখন বললেন—কর্মশুদ্ধির দ্বারাই অর্থসিদ্ধি হয়। তুমি যদি নামও শুদ্ধ করতে চাও তাহলে যাও, গ্রামে-নগরে যে ব্যক্তির নাম তোমার মাঙ্গলিক মনে হবে আমাকে এসে জানাবে। তোমার নাম সেভাবেই পালটে দেওয়া হবে।

পাপক সুন্দর নামধারী লোকদের খুঁজতে বেরিয়ে পড়ল। বাড়ী থেকে বের হওয়া মাত্রই সে এক শব-যাত্রা দেখল। জিজ্ঞেস করল, কে মারা গেছে? লোকেরা বললো—জীবক। পাপক ভাবতে লাগল—নাম যার জীবক, সেও মৃত্যুর শিকার হলো?

আরও যেতে যেতে দেখল কোন দীন-দরিদ্র দুঃখী মহিলাকে মারধোর করে ঘর থেকে বের করে দিচ্ছে। তার নাম জিজ্ঞেস করে জানল—ধনপালী। পাপক ভাবতে লাগল—নাম ধনপালী, অথচ কপর্দকশূন্য!

আরও যেতে যেতে দেখল—এক ব্যক্তি পথ হারিয়ে ফেলে লোকজনকে পথের সন্ধান জিজ্ঞেস করছে। সে তার নাম জিজ্ঞেস করে জানল—পন্থক। পাপক তখন আরও চিন্তায় পড়ল—আরে! পন্থকও পন্থা (রাস্তা) জিজ্ঞেস করছে! পন্থকও পথ হারাচ্ছে!

পাপক ফিরে এল। নামের প্রতি তার আর কোন আকর্ষণ বা বিকর্ষণ রইল না। সে সব বুঝতে পারল। নাম-এ কি আছে? জীবকও মরে অজীবকও মরে। ধনপালীও দরিদ্র হয়, অধনপালীও। পন্থকও পথ ভোলে, অপন্থকও। বাস্তবিক, নামকে অসার গুরুত্ব দেওয়া অর্থহীন। যে জন্মান্ধ তারও নাম 'নয়নসুখ'। জন্ম থেকে যে দুঃখী তার নাম 'সদাসুখ'। থাক আমার নাম 'পাপক', তাতে আমার কি যায় আসে? আমি নিজের কর্মই শোধরাবো। কর্মই প্রমুখ। কর্মই প্রধান।

যে কথা ব্যক্তির নামের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, সম্প্রদায়ের নামের ক্ষেত্রেও তাই প্রযোজ্য। বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের সমস্ত লোকই বোধিসম্পন্ন নন। জৈন-সম্প্রদায়ের সমস্ত লোকই আত্মজিত নন, ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের সমস্ত লোকই ব্রহ্মবিহারী নন। ইসলাম-সম্প্রদায়ের সমস্ত লোক সমর্পিত এবং শান্ত নন। যেমন প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যেই ভাল-মন্দ দুই-ই আছে, তেমন প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মধ্যেও ভাল-মন্দ লোক আছে। কোন সম্প্রদায়ের সব লোকই ভাল হতে পারে না আবার সব লোকই খারাপ হতে পারে না। কিন্তু সাম্প্রদায়িক আসক্তির কারণে আমরা নিজের সম্প্রদায়ের প্রত্যেক ব্যক্তিকে সজ্জন এবং অন্য সম্প্রদায়ের প্রত্যেক ব্যক্তিকে দুর্জন বলে মনে করি। বৌদ্ধ, জৈন, খৃষ্টান বা মুসলমান বলা মাত্রই কোন ব্যক্তি সজ্জন বা দুর্জন হতে পারে না। বৌদ্ধ নামধারী ব্যক্তি পরম পুণ্যবানও হতে পারেন অথবা নিতান্ত পাপীও হতে পারে। এই কথা সকল সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে সমানভাবে

প্রযোজ্য। যেমন কোন ব্যক্তিকে চেনবার জন্য তাকে একটা নাম দেওয়া হয়, সেইরূপ কোন সমুদায়কে চেনার জন্য একটা নাম দেওয়া হয় মাত্র। নামের সঙ্গে গুণের কোন সম্বন্ধ নেই। তেলভরা পাত্রের গায়ে বিশুদ্ধ 'ঘি' এর লেবেল লাগিয়ে দিলেও তেল তেলই থাকে; বিশুদ্ধ ঘি হয়ে যায় না। কোন সুন্দর ব্যক্তির নাম 'কুরূপ' রাখলে সে কুরূপ হয়ে যায় না, কোন কুরূপ ব্যক্তির নাম 'সুন্দর' রাখলেও সে সুন্দর হয়ে যায় না। ফুলকে কাঁটা অথবা কাঁটাকে ফুল বলতে থাকলেও ফুল ফুলই থাকে, কাঁটা কাঁটাই থাকে।

কোন ব্যক্তি হয়ত দীন-দরিদ্র, কিন্তু তার নাম 'রাজন্য'। এই ব্যক্তি যতদিন বুঝবে যে তার 'রাজন্য' নাম কেবল সম্বোধনের জন্য, আসলে সে দরিদ্র, ততদিন সে সজ্ঞানে আছে বলতে হবে। কিন্তু যেদিন সে ঐ নামের দম্ভ মাথায় চাপিয়ে দীন-দরিদ্র হয়েও নিজেকে প্রতাপশালী রাজা মনে করবে এবং অন্য সকলকে হেয় দৃষ্টিতে দেখতে শুরু করবে, তখন সেই উন্মত্ত ব্যক্তি লোকের উপহাসের পাত্রই হবে। কিন্তু যদি 'রাজন্য' নামধারী হাজার-লক্ষ দীন-দরিদ্র লোক সংগঠিত হয়ে নিজেদের 'রাজা' বলে মনে করতে থাকে এবং অন্য সকলকে হেয় দৃষ্টিতে দেখতে থাকে, তাহলে পাগলদের এই দল কেবল উপহাসাস্পদই নয়, বরং গোটা সমাজের পক্ষেই বিপদের কারণ হয়। ঠিক এই দশা আমাদের হয়, যখন আমরা জাতীয়তা, সাম্প্রদায়িকতা বা রাষ্ট্রীয়তার মদে প্রমত্ত হয়ে উঠি এবং নিজেই নিজেকে অন্যদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলে মনে করতে থাকি এবং অন্যদের ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখতে থাকি। এই অবস্থায় আমরাও গোটা সমাজের পক্ষে বিপজ্জনক এবং অশান্তির কারণ হয়ে থাকি। প্রকৃতপক্ষে আমরা নিজেই নিজের বিপদ ও অশান্তির কারণ হই। সুখশান্তি হারিয়ে প্রকৃত ধর্ম থেকে দূরে সরে যাই।

ধর্মকে জাতি, বর্ণ, বর্গ, সমুদায়, সম্প্রদায়, দেশ, রাষ্ট্রের সীমাতে বাঁধা যায় না। মানব সমাজের যে কোন শ্রেণীতে ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি থাকতে

পারেন। ধর্মের উপর কোন এক বর্গবিশেষেরই একচ্ছত্র অধিকার থাকতে পারে না। ধর্ম আমাদের 'ভাল মানুষ' হতে শিক্ষা দেয়। ভাল মানুষ ভাল মানুষই। সে শুধুমাত্র নিজের সম্প্রদায়ের নয়, বরং সমগ্র মানব সমাজের শোভা। যে ভাল মানুষ নয় সে ভাল হিন্দু বা মুসলমান, ভাল বৌদ্ধ বা জৈন, ভাল ভারতীয় বা বর্মী, ভাল ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় কিভাবে হবে? আর যে ভাল মানুষ—সে যথার্থ অর্থে ধর্মবান। তাকে যে নামেই ডাকা হোক না কেন, কিছু এসে যাবে না। গোলাপ গোলাপই থাকে। নাম পালটে দিলেও তার গন্ধের কোন তারতম্য হয় না। যে বাগানে গোলাপ ফুটবে কেবল সেই বাগানকেই নয়, আশপাশের সারা বায়ুমণ্ডলকেই নিজের সৌরভে সুরভিত রবে। অতএব আসল কথা হচ্ছে, আমাদের ধর্মপরায়ণ হতে হবে। ভাল মানুষ হতে হবে। নাম যাই হোক না কেন, যে সম্প্রদায়ের বাগানই হোক না কেন, তাতে যে নামেরই বোর্ড লাগানো হোক না কেন—সেখানে ফুল ফুটতে হবে, ফুলের সৌরভ ছড়াতে হবে।

সাম্প্রদায়িকতা এবং জাতীয়তার রঙীন চশমা খুলে ফেলে দেখলেই ধর্মের শুদ্ধ রূপ বোঝা যাবে। অন্যথায় নিজের সম্প্রদায়েরই রঙ-নাম-লেবেলই প্রাধান্য পেয়ে যাবে। ফলে ধর্মের সার গুরুত্ববিহীন হয়ে যাবে। ধর্মের মানদণ্ডে কোন ব্যক্তিকে পরীক্ষা করতে হলে এটা দেখা উচিত নয় যে সে কোন সম্প্রদায়ে দীক্ষিত? কোন দার্শনিক মান্যতাকে মেনে চলে? কি কি কর্মকান্ড পালন করে? বরং এটা দেখা উচিত যে তার আচরণ কিরূপ? জীবন-ব্যবহার কিরূপ? কুশল না অকুশল? সেটা পবিত্র কি না? আত্মমঙ্গলকারী এবং লোকমঙ্গলকারী কি না? যদি তা হয়, তাহলে সে যথার্থই ধর্মবান। যতটুকু আছে ততটুকুই ধর্মবান। যদি না থাকে, তাহলে ধর্মের সঙ্গে সেই ব্যক্তির কোন সম্বন্ধ নেই, সে যে নামেই নিজের পরিচয় দিক না কেন, যে সম্প্রদায়েরই হোক না কেন, যে তক্মাই লাগিয়ে চলুক না কেন। এই সাম্প্রদায়িক তক্মার সঙ্গে

ধর্মের কি'ই বা সম্বন্ধ! কেবল নাম এবং তক্‌মা থেকে আমরা কি'ই বা পেতে পারি! কারও কোন কিছু পাওয়া সম্ভব কি? মদে ভরা বোতলে দুধের লেবেল লাগানো থাকলেও সেটা পান করলে আমাদের ক্ষতিই হবে। যদি তাতে জল ভরা থাকে, তাহলে সেটা পান করে তৃষ্ণা মেটানো যেতে পারে, কিন্তু বলবান হওয়া যাবে না। বলবান হতে হলে বিশুদ্ধ দুধ পান করতে হবে, বোতলের রং-রূপ বা লেবেল যাই হোক না কেন। এই 'নাম' আর 'লেবেল'-এ কি আছে? সাম্প্রদায়িকতা, জাতীয়তা এবং রাষ্ট্রীয়তার ভূত মাথায় চেপে বসলে কেবল বোতল এবং বোতলের নাম ও লেবেলকেই গুরুত্ব দিতে সুরু করি। দুধ গৌণ হয়ে যায়, ধর্ম গৌণ হয়ে যায়।

আসুন, এই নাম এবং লেবেলের ঊর্ধ্বে উঠে নিজেদের আচরণ শোধরাই। বাক্ সংযম করে মিথ্যা, কটু কথা, নিন্দা এবং নিরর্থক প্রলাপ থেকে নিজেকে বাঁচাই। শরীরকে সংযত করার সঙ্গে সঙ্গে হিংসা, চুরি, ব্যভিচার এবং নেশা থেকে নিজেকে রক্ষা করি। নিজের জীবিকা শোধরাই, জন-অহিতকর ব্যবসা থেকে নিজেকে বাঁচাই। মনকে সংযত করে, তাকে নিজের বশে রাখতে শিখি। তাকে সতত সাবধান সজাগ হয়ে থাকার অভ্যাস করাই এবং প্রতি মুহূর্তে ঘটে চলা ঘটনাকে যেমন আছে তেমন, অর্থাৎ সাক্ষীভাবে দেখার সামর্থ্য বাড়িয়ে অন্তরের আসক্তি, বিদ্বেষ এবং মোহগ্রন্থিকে দূর করি। চিত্তকে অত্যন্ত নির্মল করে—তাকে অনন্ত মৈত্রী এবং করুণার দ্বারা পূর্ণ করি। নাম-লেবেলবিহীন ধর্মের এই মঙ্গলবিধান।

নাম ন আএ কাম

নাম বদল কর ক্যয়া মিলে? দুখী রহে দিন রৈন।
জব তক মন পর মৈল হ্যয়, নহীঁ শান্তি সুখ চৈন।।

নাম বদলনে মেঁ নহীঁ, কৌড়ী লগী ছদাম।
নাম বদলনা সরল হ্যয়, কঠিন সুধরনা কাম।।

নাম ভলা কোই রহে, সুধর জায় ব্যবহার।
বৈর ছোড় মৈত্রী করেঁ, দ্বেষ ছোড় কর প্যার।।

হিন্দু, মুসলিম, পারসী, বৌদ্ধ, ঈসাঈ, জৈন।
মৈলে মন দুখিয়া রহেঁ, কাহাঁ নাম মেঁ চৈন।।

দুর্গুণ সে হী দুখ মিলে, সদগুণ সে সুখধাম।
জন ব্যবহারী নাম সে, সধে না কোই কাম।।

লক্ষীধর ভূখোঁ মরে, যশধর হ্যঁয় বদনাম।
বিদ্যাধর অনপঢ় রহে, নাম ন আএ কাম।।

১৩
সত্য ধর্ম

সত্যধর্মের আলো প্রকাশ পেতে শুরু করেছে। পাপের অন্ধকার দূর করার সময় নিকটবর্তী। এই মঙ্গলময় ধর্মবেলার লাভ গ্রহণ করুন এবং নিজের অন্তরকে ধর্মের আলোকে আলোকিত করুন। ভেতরে সঞ্চিত সমস্ত অন্ধকার, সমস্ত কলুষ দূর করুন।

আমাদের অন্তর্মনের গভীরে যে আসক্তি, বিদ্বেষ আর মোহ সঞ্চিত আছে, তাকে দূর করুন। আসক্তি, বিদ্বেষ, মোহই পাপের অন্ধকার। এগুলোকে সরাতে পারলেই ধর্মের প্রকাশ হবে। আমরা বড়ই ভাগ্যবান যে এইরূপ সহজ-সরল বিধি আমরা লাভ করেছি, যার দ্বারা আমরা নিজের অন্তর্মনকে ধুয়ে সত্যধর্মের পবিত্রতাকে ধারণ করতে পারি। এই সুযোগের পুরোপুরি সদ্‌ব্যবহার করুন।

এই পথে চলতে হলে এটা কখনই অনিবার্য নয় যে কেউ নিজেই নিজেকে বৌদ্ধ বলতে শুরু করবেন। বৌদ্ধ বলুন বা না বলুন, যদি আমরা সেই মহাকারুণিক 'ভগবান' তথাগতের প্রদর্শিত সহজ সরল পন্থাকে নিজস্ব করে নিজের ভেতরের আসক্তি, বিদ্বেষ আর মোহের কলুষকে দূর করতে পারি, তাহলে নিশ্চয়ই এতে আমাদের লাভ হবে। আমাদের হিত-সুখ হবে। তখন আমরা নিজেদের যে নামেই ডাকি না কেন, আমরাই কল্যাণকারী মার্গের যথার্থ অনুগামী, দুঃখ-নিরোধগামিনী মার্গে যথার্থ পথিক এবং সকল দুঃখকে দূর করার যথার্থ অধিকারী।

সত্যধর্মের অভাবেই আমরা উঁচু-নীচু জাতের প্রাচীর বানিয়ে মানুষের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছি। সত্যধর্ম এই প্রাচীরগুলোকে ভেঙে সকল প্রকার বিভেদ মিটিয়ে দেয় এবং একতার ধরাতলে এইরূপ মানবীয়

সমাজ গঠন করে যেখানে জাত-পাত, উঁচু-নীচুর ভেদাভেব থাকে না। হ্যাঁ, যদি কোন ভেদাভেব থাকে, তাহলে সেটা হচ্ছে কে কতটা শীলবান, সমাধিবান এবং প্রজ্ঞাবান? কিন্তু এই বিভেদও স্থায়ী শাশ্বত নয়, কোন বাহ্য শক্তির দ্বারা পূর্বনিশ্চিত বা পূর্বনির্ধারিত নয়। প্রত্যেক মানুষের নিজের সৎ প্রযত্নের দ্বারা অধিকতর শীলবান হয়ে কায়িক এবং বাচিক দুষ্কর্ম থেকে রক্ষা পাওয়ার, অধিকতর সমাধিবান হয়ে নিজের মনকে বশীভূত করার, এবং অধিকতর প্রজ্ঞাবান হয়ে আসক্তি, বিদ্বেষ এবং মোহরূপী চিত্তমালিন্য থেকে মুক্তি পাওয়ার শক্তি আছে। সমতা যার লাভ হয়নি তার সমতা লাভ করার পুরোপুরি অধিকার আছে, পুরোপুরি সুযোগ আছে।

শীল, সমাধি এবং প্রজ্ঞাতে সম্পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি স্বভাবতঃই মৈত্রী এবং করুণার গুণাবলীর দ্বারা পরিপূর্ণ হয়ে ওঠেন। তাঁর মনে দ্বেষ এবং দৌর্মনস্য, অহংকার এবং ঘৃণা, ভয় এবং কাপুরুষতা থাকতে পারে না। তিনি জাতি, বর্ণ, কুল এবং ধনের কারণে অহং-ভাবের শিকার হন না, অথবা ওগুলোর অভাবে কোন হীন-ভাবনারও শিকার হন না। কোন ব্যক্তি যে কোন জাতি, কুল, বর্ণ বা সম্প্রদায়ে জন্মগ্রহণ করুন না কেন, তিনি ধনবান হোন বা নির্ধন হোন, শিক্ষিত হোন বা অশিক্ষিত হোন—যদি শীল, সমাধি এবং প্রজ্ঞায় প্রতিষ্ঠিত থাকেন, তাহলে তিনি নিশ্চয়ই পূর্ণ মানব, অতএব তিনি মহান্।

মানবতার এই যথার্থ মানদণ্ডে নিজে নিজেকে মাপতে থাকার অভ্যাস বাড়ান এবং যদি নিজের শীল, সমাধি এবং প্রজ্ঞায় সামান্য দৌর্বল্যও কখনও দেখা যায়, তাহলে তার পুষ্টিসাধনে যত্নবান হোন, এবং এইভাবে নিজের যথার্থ কল্যাণ সাধন করুন।

ধর্ম পন্থ্ সুখ পন্থ্

জাগো লোগো জগতকে, বীতী কালী রাত।
হুয়া উজালা ধর্ম কা, মঙ্গল হুয়া প্রভাত।।

আও মানব মানবী, চলেঁ ধর্ম কে পন্থ্।
ধর্ম পন্থ্ হী শান্তি পথ, ধর্ম পন্থ্ সুখ পন্থ্।।

প্রজ্ঞা, শীল, সমাধি কী, বহে ত্রিবেণী ধার।
জন জন কা হোওয়ে ভলা, জন জন কা উপকার।।

দ্বেষ অউর দুর্ভাব কা, রহে না নাম নিশান।
স্নেহ অউর সদভাব সে, ভর লেঁ তন-মন-প্রাণ।।

খণ্ড-খণ্ড হো জাতি কা, সম্পত্তি কা অভিমান।
শুদ্ধ সাম্য ফির সে জগে, হো জন জন কল্যাণ।।

অহংকার মমকার কী, টুটে সভী দীওয়ার।
উমড়ে মন মেঁ প্যার কী, ধর্ম গঙ্গ কী ধার।।

১৪
বিপশ্যনা কি?

বিপশ্যনাকে বুঝুন। ভাল করে না বুঝলে যথার্থ বিপশ্যী হতে পারবেন না।

বিপশ্যনা কি?

বিপশ্যনা কোন যাদু নয়, যা আমাদের মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখতে সক্ষম হবে। বিপশ্যনা কোন সম্মোহনী বিদ্যা নয়, অন্য কারও দ্বারা সম্মোহিত হয়ে যাতে আমরা নিজেদের জ্ঞানবুদ্ধি হারিয়ে বসি। সাপ, বিছে, ভূত-প্রেতকে যেমন মন্ত্রমুগ্ধ করা যায়, বিপশ্যনা সে রকম কোন মন্ত্র বিদ্যা নয়। বিপশ্যনা কোন অন্ধ ভক্তি বা অন্ধ ভাবাবেশ নয় যার ভাবোন্মাদনায় আমরা উন্মত্ত হয়ে থাকতে পারি। বিপশ্যনা কোন ভজন, কীর্তন, সঙ্গীত বা নৃত্য নয় যাতে ভাববিভোর হয়ে আমরা আত্মবিস্মৃত হয়ে থাকতে পারি। বিপশ্যনা কোন ঋদ্ধি বা অলৌকিক কিছু নয় যাতে চমৎকৃত হয়ে আমরা বিস্ময় বিমূঢ় হয়ে থাকতে পারি। বিপশ্যনা শব্দের ইন্দ্রজালের মায়া নয়, যাতে কারও বাণীবিলাস দ্বারা আমরা নিজেদের বুদ্ধিবিলাস করতে পারি। বিপশ্যনা কোন দার্শনিক কচকচি নয়, যাতে কসরত করতে করতে আমরা মশগুল হয়ে থাকতে পারি। বিপশ্যনা তত্ত্বচিন্তকগণের কোন আখড়া নয়, যাতে আমরা বাদী-বিবাদী হয়ে, তার্কিক হয়ে শব্দের চুল চেরা বিচার করতে করতে বুদ্ধির খেলায় নিজেই নিজেকে বিভ্রান্ত করতে পারি। বিপশ্যনা কোন বিশিষ্ট বেশভূষা নয়, যা পরিধান করে আমরা নিজেদের ধার্মিক বলে অহংকার করতে পারি। বিপশ্যনা কোন সংস্কার বা কর্মকাণ্ড নয় যার অনুষ্ঠান করে আমরা ধর্মের নামে আত্ম-ছলনা করে থাকতে পারি। বিপশ্যনা কোন 'গ্রন্থপাঠ-অনুষ্ঠান' নয় যাকে

পালন করে আমরা সংসারের বৈতরণী পার হবার স্বপ্ন দেখতে পারি। কোন দৃশ্য বা অদৃশ্য ব্যক্তির শরণাগত হয়ে নিশ্চিন্ত ও অকর্মন্য হ'য়ে বসে থাকা বিপশ্যনা নয়। বিপশ্যনা কোন কাল্পনিক ত্রাণকর্তা দেবতা ব্রহ্মা বা কোন দাম্ভিক ধর্মাচার্যের মিথ্যা আশ্বাস নয়, যা ডুবন্ত লোকের তৃণ অবলম্বনের ন্যায় আমাদের সহায়ক হতে পারে। তাহলে বিপশ্যনা কি?

বিপশ্যনা হচ্ছে সত্যের উপাসনা। সত্যের মধ্যে দিয়েই বাঁচার অভ্যাস। সত্য হচ্ছে যথার্থ। যথার্থ কেবল বর্তমান মুহূর্তেরই হতে পারে। বাস্তব এই বর্তমান মুহূর্তটিই হয়। বিপশ্যনা হচ্ছে এই বর্তমান মুহূর্তে বাঁচার অভ্যাস। এই বর্তমান মুহূর্তে অতীতের কোন জল্পনা অথবা ভবিষ্যতের কোন কল্পনা নেই। অতীতের জল্পনার আকুলতা অথবা ভবিষ্যতের স্বপ্নের ব্যাকুলতা এতে নেই। আবরণ, মায়া, বিপর্যয়, ভ্রম-ভ্রান্তি বিহীন এই বর্তমান মুহূর্তে যা সত্য, যা যেমনটি আছে তার প্রকৃত স্বভাবকে ঠিক তেমন ভাবে দেখা এবং বোঝাই হচ্ছে বিপশ্যনা। বিপশ্যনা অর্থ সম্যক্ দর্শন। বিপশ্যনা অর্থ সম্যক্ জ্ঞান।

যেটা যেমন তাকে ঠিক সেই রকম দর্শন করে এবং বুঝে যে আচরণ হবে তাই যথার্থ আচরণ, কল্যাণকারী সম্যক্ আচরণ। বিপশ্যনা হচ্ছে সম্যক্ আচরণ।

বিপশ্যনা পলায়ন নহে, জীবন-বিমুখতা নহে, বরং জীবন-অভিমুখী হয়ে বাঁচার প্রণালী। বিপশ্যনা যেন খোলা হাওয়ায় মাটির উপর পা রেখে চলার শৈলী। বিপশ্যনা বুদ্ধি-বিলাস নহে, বরং শুদ্ধ ধর্ম—শীল পালন করার বিধি। বিপশ্যনা নিজ এবং সর্ব মঙ্গলময়ী আচার-সংহিতা। স্বয়ং সুখে বাঁচা এবং অন্যদের সুখে বাঁচতে দেওয়ার কল্যাণকারী জীবনপদ্ধতি। বিপশ্যনা হচ্ছে আত্মমঙ্গল এবং সর্বমঙ্গল। বিপশ্যনা হচ্ছে আত্মোদয় এবং সর্বোদয়।

বিপশ্যনা হচ্ছে আত্মনির্ভরতা। কোনও বাহ্যিক সাহায্য ব্যতিরেকে নিজের পায়ে দাঁড়াবার মঙ্গলবিধি। স্বাবলম্বনের সর্বোৎকৃষ্ট সাধন। বিপশ্যনা হচ্ছে আত্মদর্শন, আত্মনিরীক্ষণ এবং আত্মপরীক্ষণ। নিজের

ভেতরের (চিত্তের) কতটা ময়লা বের হল? কতটা বাকী আছে? কতটা নির্মলতা এল? কতটা বাকী আছে? কতটা দুর্গুণ দূর হয়েছে? কতটা বাকী আছে? কতটা সদ্‌গুণ এল? কতটা বাকী আছে? স্বয়ং নিজেকে মূল্যায়ন করার সচেতনতাই বিপশ্যনা। স্বয়ং চোর, স্বয়ং পাহারাদার। স্বয়ং রোগী, স্বয়ং চিকিৎসক। অজ্ঞান থেকে জ্ঞান, ময়লা থেকে নির্মলতা, রোগ থেকে আরোগ্য, দুঃখ থেকে দুঃখমুক্তির দিকে ক্রমশঃ এগিয়ে যাওয়ার জন্য নিজের প্রয়াসই বিপশ্যনা। বিপশ্যনা সঠিক প্রয়াস এবং প্রযত্ন অথবা সম্যক্ অভ্যাস, সম্যক্ ব্যায়াম।

বিপশ্যনা হচ্ছে আত্মসংযম। নিজের মনে ময়লা উৎপন্ন না হতে দেওয়ার সংযম। বিপশ্যনা হচ্ছে 'আত্ম-নির্জরা'—নিজের মনের পুরানো ময়লা পরিস্কার করা। নতুন ময়লা অন্যে নয়, আমরাই স্বয়ং মোহবিমূঢ় হয়ে উৎপন্ন করে থাকি। অতএব স্বয়ং প্রযত্নপূর্বক সতত সজাগ থেকে নতুন ময়লা উৎপন্ন হতে না দেওয়াই বিপশ্যনা। পুরানো ময়লাও অন্য কারও দ্বারা সঞ্চিত হয়নি। প্রমাদবশতঃ আমরাই স্বয়ং সৃষ্টি করেছি। অতএব একে দূর করার সম্পূর্ণ দায়িত্বও নিজের, অন্য কারও নয়। নিজের পুরানো ময়লাকে নিজেই দূর করাই বিপশ্যনা। ধৈর্য্য সহকারে প্রযত্নপূর্বক অল্প অল্প ময়লা দূর করতে থাকলে একদিন পূর্ণ নির্মলতা প্রাপ্ত হওয়া যাবেই, মন নির্মল হলে সদ্‌গুণের দ্বারা পূর্ণ হয়ে যাবে এবং দূষিত মনের কারণে উৎপন্ন সমস্ত শারীরিক রোগ, সমস্ত দুঃখ দূর হয়ে যাবে। বিপশ্যনা হচ্ছে আরোগ্যবর্ধিনী সঞ্জীবনী ঔষধি, চিত্তশোধনী ধর্মগঙ্গা, দুঃখনিরোধগামিনী মার্গ, মুক্তিদায়িনী ধর্মবীথি।

বিপশ্যনা শীল এবং সমাধিতে স্থিত হয়ে অন্তঃপ্রজ্ঞা জাগ্রত করার পবিত্র অভ্যাস। ধীরে ধীরে প্রজ্ঞা পুষ্ট করার সৎ প্রয়াস। স্থিতপ্রজ্ঞ হওয়ার শুভ আয়াস। প্রজ্ঞা অর্থাৎ প্রত্যেক উৎপন্ন পরিস্থিতিকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে জানা, বিমোহিনী একান্তদৃষ্টি ত্যাগ করে সত্যদর্শিনী অনেকান্ত দৃষ্টি দ্বারা যথার্থ সত্যকে সর্বাঙ্গীণ নিরীক্ষণ করা, প্রকাশিত সত্যের যথার্থ স্বভাবের সাক্ষীভাবে সাক্ষাৎকার—ইহাই বিপশ্যনা। বিপশ্যনা হচ্ছে নিঃসঙ্গ দর্শন, নির্লিপ্ত নিরীক্ষণ এবং নিতান্ত অনাসক্তি।

অনুকূল-প্রতিকূল পরিস্থিতির সন্মুখীন হয়ে তাকে ঠিক ঠিক না দেখে না বুঝে সহসা অন্ধ প্রতিক্রিয়া করা হচ্ছে প্রজ্ঞাহীনতা। ইহাই মানসিক ক্ষোভ, উত্তেজনা, বিকৃতি, অসাম্য, অশান্তি—অতএব দুঃখ। পরন্তু এই রকম প্রত্যেক অবস্থাকে বিবেকপূর্বক দেখে উপলব্ধি করে নিজের মনের সমতা রক্ষা করাই হচ্ছে প্রজ্ঞা। আগত পরিস্থিতির সংযত চিত্ত দ্বারা মোকাবিলা করাই ধর্মাচরণ, মঙ্গলাচরণ। ইহাই বিপশ্যনা। উৎপন্ন স্থিতিকে আঁকড়ে ধরা অথবা দুরে ঠেলে দেওয়ার তাৎক্ষণিক প্রচেষ্টা থেকে সংযত হয়ে শান্তিপূর্ণ ভাবে কর্তব্য সম্পাদন করা—ইহাই সম্যক্ জীবন-ব্যবহার। ইহাই বিপশ্যনা। অন্যদের বদলাবার প্রচেষ্টার পূর্বে নিজেকে বদলানোই হচ্ছে শুদ্ধচিত্তের ব্যবহারকৌশল। ইহাই বিপশ্যনা। বিপশ্যনা হচ্ছে আত্ম-সংযম, আত্ম-সমতা, ভারসাম্য এবং আত্ম-সংবরণ।

বিপশ্যনা হচ্ছে আত্মশুদ্ধি, আত্মবিমুক্তি। বিকারমুক্ত শুদ্ধ চিত্তে মৈত্রী এবং করুণার অজস্র ঝরণাধারা অনায়াসে ঝরতে থাকে। ইহাই মানবজীবনের চরম উপলব্ধি, ইহাই বিপশ্যনা সাধনার চরম পরিণতি।

বিপশ্যনার সিদ্ধি অবশ্যই কঠিন, কিন্তু অসম্ভব নয়। অবশ্যই ইহা কষ্টসাধ্য কিন্তু অসাধ্য নয়। বিপশ্যনা স্ব-প্রযত্নসাধ্য। কেবল একটি বা একাধিক বিপশ্যনা শিবিরে সম্মিলিত হলেই সব কিছু হবে না। ইহা আজীবন অভ্যাসের বিষয়। বিপশ্যনার জীবন সর্বদাই যাপন করতে হবে। সর্বদা সজাগ, সচেষ্ট এবং প্রযত্নশীল হতে হবে।

অতএব, অদম্য উৎসাহের সঙ্গে বিপশ্যনার মঙ্গলপথে এগিয়ে চলুন। চলতে গিয়ে বারবার পড়ে গেলেও আবার উঠে দাঁড়িয়ে হাঁটু দুটোকে একটু মালিশ করে, কাপড়-চোপড় ঝেড়ে আবার এগিয়ে যেতে হবে। প্রত্যেক স্খলন বা পতন পরবর্তী পদক্ষেপকে আরও দৃঢ় করবে, প্রত্যেক হোঁচট লক্ষ্যে পৌঁছবার পথে নতুন উৎসাহ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি করবে। অতএব, দাঁড়িয়ে না থেকে, অপেক্ষা না করে এগিয়ে চলুন। পদে পদে এগিয়ে চলুন। ইহাই যথার্থ মঙ্গলবিধান।

কাট লিএ দুখ দ্বন্দ

অন্ধ ভক্তি ন ধর্ম হ্যয়, নহীঁ অন্ধ বিশ্বাস।
বিন বিবেক শ্রদ্ধা জগে, করে ধর্ম কা নাশ।।

মান মোহ মায়া মিটে, সহজ সরল ঋজু হোয়।
ক্রোধ মিটে কটুতা মিটে, সহী বিপশ্যী সোয়।।

পল পল জাগ্রত হী রহে, শুদ্ধ সত্য কা বোধ।
মন কী সমতা স্থির রহে, হোওয়ে দুঃখ নিরোধ।।

ক্ষণ ক্ষণ মঙ্গল হী জগে, ক্ষণ ক্ষণ সুখ হী হোয়।
ক্ষণ ক্ষণ আপনে কর্ম পর, সাবধান য়দি হোয়।।

পর হী দেখে সর্বদা, স্ব দেখে না কোয়।
সম্যক দর্শন স্বয়ং কা, বিপশ্যনা হ্যয় হোয়।।

যো না দেখে স্বয়ং কো, ওহী বাঁধতা বন্ধ।
যিসনে দেখা স্বয়ং কো, কাট লিয়ে দুখ দ্বন্দ্ব।।

১৫
ধর্মচক্র

আমাদের ভেতরে প্রতি মুহূর্তে যে লোকচক্র চলছে তার থেকে মুক্তি পেতে হলে ধর্মচক্র প্রবর্তিত করতে হবে। লোকচক্র আমাদের যাবতীয় দুঃখের মূল। ধর্মচক্র সমস্ত দুঃখের নিরোধক।

লোকচক্র কি? লোকচক্র হচ্ছে মোহ, মূঢ়তা। লোকচক্র অজ্ঞান, অবিবেক এবং অবিদ্যা যার জন্য আমরা নিরন্তর আসক্তি এবং বিদ্বেষের জাঁতায় পিষ্ট হচ্ছি। আমাদের ছয়টি ইন্দ্রিয়—চোখ, কান, নাক, জিভ, শরীরের ত্বক এবং মন, এগুলোর ছয়টি বিষয়—রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস, স্পর্শ এবং কল্পনা; এদের পরস্পর সংস্পর্শ হতে থাকে, চোখের সঙ্গে রূপের, কানের সঙ্গে শব্দের, নাকের সঙ্গে গন্ধের, জিভের সঙ্গে রসের, ত্বকের সঙ্গে স্পর্শের এবং মনের সঙ্গে কল্পনার। বিষয়ের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের সংস্পর্শ হওয়া মাত্রই চিত্তে কোন সংবেদনা (অনুভূতি) জাগে। যদি এই সংবেদনা আমাদের প্রিয় হয়, তাহলে তৎসম্বন্ধীয় বিষয় থেকে আমাদের আসক্তি উৎপন্ন হয়। যদি ঐ সংবেদনা অপ্রিয় হয়, তাহলে আমাদের দ্বেষ বা বিদ্বেষ উৎপন্ন হয়। আসক্তি উৎপন্ন হোক অথবা বিদ্বেষ উৎপন্ন হোক, দুটোই আমাদের মনে চাঞ্চল্য এবং উত্তেজনা সৃষ্টি করে। এতে সমতা নষ্ট হয়। বিষমতা উৎপন্ন হয়। দুঃখসন্ধি হয়। দুঃখ আরম্ভ হয়। ইহাই লোকচক্রের আরম্ভ।

অজ্ঞানতা থেকে আমাদের মধ্যে যে উত্তেজনার সৃষ্টি হয় তাই গভীর আসক্তিতে পরিবর্তিত হয়ে দূষিত ভবচক্রের রূপে বাড়তে থাকে, আমাদের ব্যাকুল, ব্যথিত করে এবং আমাদের দুঃখের সংসার বাড়াতে থাকে। এই ভবচক্রকে ধ্বংস করার জন্য আমাদের ভেতরে ধর্মচক্র জাগ্রত থাকা নিতান্তই আবশ্যক। যদি ধর্মচক্র জাগ্রত হয়, তাহলে বিবেক, বিদ্যা এবং সচেতনতা জাগে। যেমন কোন ইন্দ্রিয় এবং ইহার বিষয়ের পরস্পর

সংস্পর্শের ফলে চিত্তে কোন সংবেদনা উৎপন্ন হয়, প্রিয়ই হোক বা অপ্রিয় হোক, সুখদ হোক বা দুঃখদ হোক—সেই রকম পাগলের মতো ঐ বিষয়ের প্রতি আসক্তি রঞ্জিত এবং দ্বেষ-দূষিত না হয়ে ইহার নশ্বর-নিঃসার স্বভাবকে জেনে প্রজ্ঞা এবং অনাসক্তিভাব জাগ্রত করা উচিত। এর দ্বারাই লোকচক্রের বা ভবচক্রের প্রবর্তন রুদ্ধ হয়। ইহার বিস্তার লাভ হয় না। ইহাই ধর্মচক্র প্রবর্তন। ধর্মচক্র প্রবর্তনের এটাই প্রত্যক্ষ লাভ। বিপশ্যনা সাধনার নিরন্তর অভ্যাসের দ্বারা নিজের অন্তর্মনে অনুভূত প্রত্যেক সংবেদনাকে জানুন এবং জেনে তাতে আসক্ত হবেন না। তটস্থ হয়ে থাকুন। ধর্মচক্র প্রবর্তিত রাখুন।

ধর্মচক্র প্রবর্তিত রাখলে আমাদের মঙ্গল এবং কল্যাণই হবে।

বন্ধন খুলতে জায়ঁ

রাগ সদৃশ না রোগ হ্যয়, দ্বেষ সদৃশ না দোষ।
মোহ সদৃশ না মূঢ়তা, ধর্ম সদৃশ না হোশ।।

রাগ দ্বেষ কী মোহ কী, যব তক মন মেঁ খান।
তব তক সুখ কা, শান্তি কা, জরা ন নাম নিশান।।

তিন বাত বন্ধন বঁধে, রাগ দ্বেষ অভিমান।
তিন বাত বন্ধন খুলে, শীল সমাধি জ্ঞান।।

ধর্মচক্র চালিত করেঁ, প্রজ্ঞা লেয়ঁ জগায়।
জিসসে সারী গন্দগী, মন পর কী হট জায়।।

সুখ দুখ আতে হী রহেঁ, জো আওয়েঁ দিন রৈন।
তূ কিউঁ খোয়ে বাওলা! অপনে মন কী চৈন।।

ভোক্তা বন কর ভোগতে, বন্ধন বঁধতে জায়ঁ।
দ্রষ্টা বন কর দেখতে, বন্ধন খুলতে জায়ঁ।।

১৬

সম্যক্ ধর্ম

'সম্যক্' মানে হচ্ছে ঠিক, যথার্থ, সত্য। অতএব সম্যক্ ধর্ম মানে সত্যধর্ম, সৎ ধর্ম, সদ্ধর্ম—যে ধর্মে মিথ্যার কোন স্থান নেই, কল্পনার সঙ্গে যার কোন সম্পর্ক নেই। যদি কোন উপদেশক কোন মিথ্যা কথাকে, শুধু মিথ্যা কেন কোন সত্য কথাকেও অন্ধ শ্রদ্ধার দ্বারা কেবল কল্পনার স্তরে স্বীকার করার আগ্রহ প্রকাশ করেন তাহলে মনে করবেন সেটা সম্যক্ নয়, মিথ্যা ধর্মের উপদেশই তিনি করছেন।

সম্যক্ মানে শুদ্ধ, স্বচ্ছ, নির্মল, নির্দোষ, নিষ্কলুষ। অতএব সম্যক্ ধর্মের অর্থ শুদ্ধধর্ম, যেখানে পাপের কোনও স্থান নেই। যার সঙ্গে জোর-জবরদস্তীর কোন সম্পর্ক নেই। ধর্ম নির্মল হলে সহজ স্বীকার্য হয়, কারণ সেটা ন্যায় সঙ্গত হয়, যুক্তিসঙ্গত হয়। যদি কোন উপদেশক বলেন—আমার কথা নির্বিচারে, বিনা তর্ক-বিতর্কে, বিনা বুদ্ধিপ্রয়োগে, চোখ বুজে এইজন্যই মেনে নাও, কারণ না মানলে কোন অদৃশ্য সত্তা তোমাদের অসহ্য নারকীয় যন্ত্রণার দণ্ড দেবে, আর মানলে প্রসন্ন হয়ে তোমাদের সমস্ত পাপ থেকে অব্যাহতি দেবে এবং স্বর্গীয় সুখের আশীর্বাদ দেবে—তাহলে বুঝবেন সেটা সম্যক্ নয়, মিথ্যা ধর্মেরই ছলনা।

সম্যক্ মানে অক্ষত, অখণ্ড, অবিকল, পূর্ণ। সম্যক্ ধর্মের অর্থ পরিপূর্ণ পরিপক্ক ধর্ম। ধর্মের পরিপূর্ণতা, পরিপক্কতা তাকে সম্পূর্ণ রূপে ধারণ করার মধ্যেই নিহিত। কেবল পঠন-পাঠন, চর্চা-পরিচর্চা ধর্মের অবিকল্প পরিপূর্ণতা নয়। বুদ্ধি-বিলাস এবং বুদ্ধিরঞ্জন ধর্মের পূর্ণ পরিপক্কতা নয়। পড়ে এবং শুনে ধর্মের চিন্তন-মনন করে তাকে সম্যক্ ভাবে ধারণ করে নেওয়া, জীবনের সঙ্গী করে নেওয়া, সহজ স্বভাব করে নেওয়াই

ধর্মের পরিপূর্ণতা ও পরিপক্কতা। এটাই ধর্মের সম্যকত্ব। যদি কোন উপদেশক বলেন—আমার কথা শোনা মাত্রই অথবা অমুক ধর্মগ্রন্থ পাঠ করা মাত্রই অথবা অমুক দার্শনিক সিদ্ধান্তকে স্বীকার করে নেওয়া মাত্রই তোমাদের মুক্তি হয়ে যাবে, ধর্ম ধারণ না করলেও এক অদৃশ্য সত্তা এতেই তোমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে তোমাদের সমস্ত পাপ ধুয়ে দেবে—তাহলে বুঝবেন সেটা সম্যক্ নয়, তা অলীক, মায়া।

সত্য এবং শুদ্ধ ধর্মজীবনে প্রবেশ করতে হবে—তাহলেই তা সম্যক্ এবং কল্যাণপ্রদ হবে। অন্যথায় ভ্রান্ত এবং দুঃখদায়ী। যে ব্যক্তির ধর্মের স্বরূপ সামান্যও উপলব্ধ হয়েছে তিনি সর্বদাই এই ভ্রান্তি থেকে নিজেকে বাঁচাবার চেষ্টা করেন। তিনি ধর্মকে চিরাচরিত প্রথা পালন এবং বুদ্ধি-বিলাসের বিষয় হতে দেন না। তাঁর সমগ্র শক্তি ধর্মকে ধারণ করার অভ্যাসেই নিয়োজিত করেন। এ বিষয়ে আমাদের দেশেরই এক প্রসিদ্ধ প্রাচীন ঘটনা আছে। কুরু প্রদেশের বালক রাজকুমার যুধিষ্ঠির। অন্য রাজকুমারদের সঙ্গে তিনিও গুরুর কাছ থেকে দুটো ছোট ছোট বাক্যে ধর্ম সম্বন্ধে উপদেশ লাভ করেছেন। অন্যান্যরা ঐ বাক্য দুটোকে মুখস্থ করে গুরু মহারাজের সাধুবাদ সহজেই আদায় করে নিল। কিন্তু বালক যুধিষ্ঠিরের কাছে সম্যক্ ধর্মই ছিল যথার্থ ধর্ম। তিনি সেই ধর্মকে ধারণ করার অভ্যাসে দিন কাটাতে লাগলেন এবং এই কারণে নির্বোধ গুরু তাঁর প্রতি রুষ্ট হলেন। সম্যক্মার্গী সুবোধ রাজকুমারের শাস্তি হ'ল। যদিও দোষী ছিলেন নির্বোধ আচার্য। আর বেচারা আচার্যই বা কি করবেন? তিনিও চিরাচরিত সংস্কার এবং পরম্পরার শিকার ছিলেন। খোলসকেই তাঁর ধর্ম বলে মানার অভ্যাস ছিল। তাঁর কাছে ধর্মের খোলসই অধিক মূল্যবান ছিল। — এই রাজকুমারদের ধর্মের কিছু কথা শিখিয়ে দেব। তারা মুখস্থ করে রাখবে। বাড়ী ফিরলে মা-বাবা জিজ্ঞেস করবেন—পাঠশালাতে আজ কি কি পড়েছো? বিদ্যার্থীরাও মুখস্থ করা সেই ধর্ম-বাণী তোতা পাখীর মতো শুনিয়ে দেবে। মা-বাবাও খুশীতে ডগমগ হয়ে যাবেন। আচার্যেরও শ্রম সফল হবে। তিনি পুরস্কৃত হবেন। তাঁর জীবিকাও

সচ্ছলভাবে চলতে থাকবে।—গুরুজীর দৃষ্টিতে ধর্মের পঠন-পাঠনের এটুকুই মূল্য ছিল। ধর্মের এই নিকৃষ্ট এবং লঘু মূল্যায়ন না জানি কবে থেকে দেশে চলে আসছে! আজও তা বর্তমান আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। পড়া, শোনা বা মুখস্থ করার কাজ সরল। কিন্তু জীবনে সেগুলোকে প্রয়োগ করার কাজ কঠিন, অত্যন্ত কঠিন। কঠিন বলেই কেউ তা করতে চায় না। এই জন্যই আমরা ধর্মের নামে অধিকতর মিথ্যাধর্মেরই শিকার হয়ে থাকি। সম্যক্ ধর্ম আমাদের থেকে অনেক অনেক দুরে থেকে যায়। কাছে আসবেই বা কি করে? যখন মিথ্যাকেই সম্যক্ বলে মেনে বসে থাকি, তখন মিথ্যাই হয় প্রমুখ এবং সম্যক্ গৌণ হয়ে যায়। অতএব সম্যক্‌কে কাছে নিয়ে আসার কোন চেষ্টাও আমরা করি না।

কায়া, বাক্ এবং চিত্তের সকল কর্মে ধর্মের সমাবেশ করতে পারলেই তা সম্যক্। যদি একেই জীবনের চরম লক্ষ্য মনে করে অভ্যাস করতে পারা যায়, তাহলে যতটা সাফল্য লাভ করা যায়, ততটাই লাভ। পূর্ণ সাফল্য পেলে নিঃসন্দেহে পূর্ণ লাভ। সর্বাঙ্গীণ সম্যক্ ধর্মকে জীবনে প্রয়োগ করার অভ্যাস করাতেই আমাদের যথার্থ মঙ্গল নিহিত রয়েছে। জাতি-ধর্ম-সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকলেরই যথার্থ মঙ্গল এতে নিহিত আছে। দেখুন, ধর্মের সর্বাঙ্গীণ সম্যক্ স্বরূপ কি?

আমাদের বাক্য সম্যক্ হবে। বাক্য সম্যক্ তখনই হয় যখন আমরা মিথ্যাকপটতা, গালি-গালাজ, কটু-কঠোর, চুক্‌লি-নিন্দা এবং অকারণ কথাবার্তা বলা থেকে বিরত থাকি।

আমাদের শারীরিক কর্ম সম্যক্ হবে। শারীরিক কর্ম তখনই সম্যক্ হয় যখন আমরা হিংসা, হত্যা, চুরি-জোচ্চুরী, নেশাদি দুষ্কর্ম থেকে যথার্থই বিরত থাকি।

আমাদের জীবিকা সম্যক্ হবে। জীবিকা তখনই সম্যক্ হয় যখন আমরা নিজেদের জীবনযাপনের প্রণালীগুলোকে বাস্তবিকতার স্তরে বিশুদ্ধ করার জন্য ছল, চাতুরি, জালিয়াতি, চুরি, ডাকাতিকে সর্বথা ত্যাগ করতে পারি এবং এমন কোন ব্যবসা না করি যার দ্বারা ধন সঞ্চয়ের তীব্র লালসার বশীভূত হয়ে অন্য অনেকের ক্ষতিসাধন করতে হয়।

আমাদের প্রচেষ্টা সম্যক্ হবে। প্রচেষ্টা তখনই সম্যক্ হয় যখন প্রত্যেক প্রচেষ্টা বাস্তবিক এমনই এক ব্যায়ামে পরিণত হয় যার দ্বারা আমাদের মন দুর্গুণ থেকে মুক্ত এবং সদগুণসম্পন্ন হয়।

আমাদের সচেতনতা সম্যক্ হবে। সচেতনতা তখনই সম্যক্ হয় যখন আমরা নিজেদের কায়িক, বাচিক এবং মানসিক কর্মসমূহের প্রতি সজাগ, সচেতন থাকার প্রকৃত অভ্যাসে নিরত থাকি।

আমাদের সমাধি সম্যক্ হবে। সমাধি তখনই সম্যক্ হয় যখন সতত অভ্যাসের দ্বারা আমরা নিজেদের চিত্তকে কোন সত্য-অবলম্বনের আশ্রয়ে বেশীক্ষণ সজাগ, সচেতন এবং সমাহিত রাখতে পারার প্রকৃত সাফল্য লাভ করি।

আমাদের সংকল্প সম্যক্ হবে। সংকল্প তখনই সম্যক্ হয় যখন আমরা নিজেদের চিত্তপ্রবাহ থেকে হিংসা, ক্রোধ, দ্বেষ, দৌর্মনস্যের দুর্বৃত্তিকে দূর করতে সক্ষম হই।

আমাদের দর্শন সম্যক্ হবে। দর্শন তখনই সম্যক্ হয়, যখন আমরা বুদ্ধিবিলাস থেকে মুক্তি পেয়ে পরম সত্যকে যথার্থতঃ দর্শন করতে পারি।

দর্শন শব্দের অর্থ **'ফিলসফী'** নয়। অন্যথায় কোন মত-মতান্তরের ফিলসফীর সিদ্ধান্তের চিন্তন-মননই আমাদের কাছে সম্যক্ দর্শন হয়ে বসবে এবং এই প্রকার মিথ্যা দর্শনে আমরা জড়িয়ে থাকবো। দর্শন মানে সাক্ষাৎকার। কিন্তু সাক্ষাৎকারের অর্থও এটা নয় যে বারবার গভীর অভ্যাসের দ্বারা বাস্তব থেকে দূরবর্তী কোন কল্পনা-প্রসূত রং-রোশনাই বা রূপ-আকৃতিকে চোখ বন্ধ করে দেখে সেই মিথ্যা দর্শনকে সম্যক্ দর্শন মনে করা। দর্শন মানে হচ্ছে সত্যের স্ব-নুভূতি। নিজের অভ্যন্তরে স্থূল সত্য থেকে আরম্ভ করে সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর সত্যসমূহের স্বানুভবের কালে যখন পরম সত্যের স্বানুভূতি হয়, তখনই দর্শন সম্যক্ হয়। সম্যক্ দর্শনের এই অনুভূতি থেকে যথার্থ যে জ্ঞান হয় সেই জ্ঞানই সম্যক্। অন্যথায় বুদ্ধি-বিলাসের ফলে মিথ্যা জ্ঞান হয়। সম্যক্ দর্শন এবং সম্যক্

জ্ঞান হচ্ছে একই মুদ্রার দুই দিক। উভয়েরই উপলব্ধি সাথে সাথেই হয়। সম্যক্ দর্শন হয়ে গেলে সম্যক্ জ্ঞান, সম্যক্ বোধ হয়েই যায়—ইহাই ধর্মের আচরণের চরম উৎকর্ষ।

সর্বদা অভ্যাস করতে করতে সর্বাঙ্গীণ ধর্মকে যখন আমরা সম্যক্ করতে পারি, পরম পরিশুদ্ধ করতে পারি—তখন জীবন-ব্যবহারে স্বভাবতঃ সর্বতোমুখী উন্নতি হয়। কায়িক, বাচিক এবং মানসিক কর্মসমূহ থেকে অশুদ্ধি দূর হয়। জীবন কৃতকৃত্য হয়, ধন্য হয়। ত্রিবিধ আচরণ নিজের থেকেই শুধরে যেতে শুরু করে। চরিত্র সম্যক্ হয়। যদি এইরকম না করে কেবল কোন সম্প্রদায় বিশেষের সংস্কার পরম্পরাকে পালন করে নিজেই নিজেকে সম্যক্ সচ্চরিত্র বলে জাহির করি, তাহলে সেটা হবে ধোঁকাবাজী। চিত্ত বিকারমুক্ত হলো না, নিজের ব্যবহারে সৌম্যতা এলো না, পারস্পরিক আচরণে শুদ্ধি এলো না—তবুও নিজেকে সম্যক্ চরিত্রবান বললে মিথ্যাকেই সম্যক্ বলে মেনে নেওয়ার ভ্রান্তি হবে।

ধর্মের তিন অঙ্গ—**পরিয়ত্তি, পটিপত্তি** এবং **পটিবেধ**। পরিয়ত্তির অর্থ হচ্ছে ধর্মের শাস্ত্রীয় জ্ঞানের নিপুণতা। পটিপত্তির অর্থ হচ্ছে ধর্মপন্থার স্বয়ং প্রতিপালন অর্থাৎ বাস্তব জীবনের ব্যবহারে ধর্মকে লাগানো। পটিবেধ হচ্ছে মার্গের অনুশীলনে রত থেকে সমস্ত বাধাবিঘ্নকে দূর করে ধর্মের অন্তিম লক্ষ্যকে লাভ করা। ধর্মের পরিয়ত্তি অঙ্গ নিরর্থক নয়। বরং ইহা সার্থক তখনই হয় যখন ধর্মের বাকী দুটো অঙ্গের—পটিপত্তি ও পটিবেধ'এর প্রয়োগ করা যায়।

ধর্ম শাস্ত্রীয় জ্ঞানে নয়, আচরণেই নিহিত। ধর্ম সৈদ্ধান্তিক মান্যতাতে নয়, সিদ্ধান্তকে জীবনে প্রয়োগ করার মধ্যেই নিহিত। ধর্মকে আচরণে প্রয়োগ করতে পারলেই ধর্ম পরিপূর্ণ হয়, সম্যক্ হয়, অন্যথায় মিথ্যাই থেকে যায়, তা বৌদ্ধ বা জৈন, খৃষ্টান বা হিন্দু, মুসলমান বা ইহুদী, পারসী বা শিখ যা'ই হোক না কেন।

যে কোন সম্প্রদায়ের ধর্মগুরুকে জিজ্ঞেস করে দেখুন, তিনি বলবেন—ধর্ম সম্বন্ধে উপরোক্ত কথাগুলো অর্থাৎ কায়িক, বাচিক এবং মানসিক

কর্মকে শুদ্ধ করার কথা আমাদের ধর্মেরই কথা। কেউ একথা বলবেন না—ওগুলো আমাদের ধর্মের বাইরের কথা। এই কথাগুলো সকল ধর্মেরই কথা, অতএব সর্বজনীন। সম্প্রদায়-বিশেষের নয়। তবে সঙ্গে সঙ্গে এটাও দেখা যায় যে সকল সম্প্রদায়ে এই রকম লোকের সংখ্যাই বেশী যাঁরা নিজেদের ধর্মবান বলে মনে করেন অথচ ধর্মের সার একটুও ধারণ করেন না। ধর্মকে জীবনে ব্যবহার করেন না। অতএব এই ব্যাধিও সর্বজনীন, বিশ্বব্যাপী। কোন এক সম্প্রদায় বিশেষের নয়।

আমরা ধর্মজীবন যাপন করছি না—এটা যতটা খারাপ তার চেয়ে হাজার গুণ বেশী খারাপ হচ্ছে আমরা ধর্মজীবন যাপন করছি বলে যে ভ্রম। বিচিত্র বিড়ম্বনা! রোগী হয়েও আমরা নিজেদের নীরোগ বলে মনে করি। আজব নেশা আমাদের ছেয়ে আছে। সকল সম্প্রদায়ের লোকেরই একই নেশা। যে সম্প্রদায়েরই হই না কেন, আমরা কি করি? নিজ নিজ সম্প্রদায়ের কোন বিশিষ্ট বেশভূষা ধারণ করি, অথবা নিজেদের পরম্পরাগত কোন কর্মকাণ্ড সম্পন্ন করি, অথবা নিজের সম্প্রদায়ের শাস্ত্রদ্বারা ঘোষিত কোন দার্শনিক সিদ্ধান্তের মান্যতাকে নিজের মনে কট্টর ভাবে ধারণ করি, এবং কেবল এটুকুতেই আমরা মনে করি যে আমরা ধর্মের জীবন যাপন করছি। অথচ আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ধর্মের কোন চিহ্নই দেখা যায় না। ধর্মের নামে কি গভীর আমাদের এই নেশা! পশ্চিম দেশীয় জনৈক পণ্ডিত ব্যক্তি বলেছেন—ধর্ম হচ্ছে আফিমের নেশা। যেটা ধর্ম নয় তাকে ধর্ম বলে মনে করে জীবন-যাপন শুধু আফিমের নেশা কেন বরং তার চেয়েও বড় কোন নেশা। আফিমের নেশা তো এক সময়ে কেটে যায়, কিন্তু মিথ্যা ধর্মের নেশাতে ডুবে থাকা ব্যক্তি সারাজীবন বেহুঁস অবস্থাতেই কাটিয়ে ফেলে। নেশা কাটানো তো দূরের কথা, বরং দিনের পর দিন তার ঐ নেশা বেড়েই চলে।

নিজের তথা সকলের যথার্থ মঙ্গলকামী ব্যক্তিকে এই নেশাগ্রস্ত বিপজ্জনক অবস্থা থেকে বাঁচতে হবে এবং এটা ভাল করে বুঝতে হবে যে, ধর্মের চরম পরিণতি, ধর্মের অন্তিম লক্ষ্য, ধর্মের একমাত্র উদ্দেশ্য ধর্মকে

জীবনে প্রয়োগের মধ্যেই নিহিত আছে। যে ধর্মকে পড়া-শোনা হয়েছে, চিন্তন-মনন করা হয়েছে, কিন্তু ধারণ করা হয়নি, সেটা সম্যক্ নয়, পরিপূর্ণ নয়—এখনও কাঁচা। যে মাটির কলসী কাঁচা তাকে ভরসা করে নদী পার হতে যাওয়া বিপজ্জনক। ওকে পাকাতে হবে। হাজার কাঠিন্য সত্ত্বেও ধর্মকে ধারণ করাকেই প্রাধান্য দিতে হবে। অভ্যাসের রাস্তায় কোন মাইল-নির্দেশক প্রস্তর-খণ্ড যেন আমাদের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে না পারে, কোন মায়া-মরীচিকা যেন আমাদের ভ্রান্ত করতে না পারে এবং আমাদের প্রগতি যেন থেমে না যায়। যে ধর্মকে আমরা ধর্ম বলে মানছি সেটা সম্যক্ না মিথ্যা এই সত্যকে বার বার পরখ করে দেখতে হবে এবং পরখ করার একমাত্র উপায় হচ্ছে এটা দেখা যে ধর্মকে দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োগ করা হচ্ছে কি না। আমাদের দৈনন্দিন ব্যবহারে আসছে কি না। ধর্ম যদি বাস্তব জীবনে ব্যবহৃত না হয়, তাহলে যে বেশভূষাই আমরা ধারণ করি না কেন, যে ক্রিয়াকাণ্ডই সম্পন্ন করি না কেন, যে সম্প্রদায়েই দীক্ষিত হই না কেন, যে দার্শনিক মান্যতাকেই স্বীকার করি না কেন, আত্মবাদী বা অনাত্মবাদী, ঈশ্বরবাদী বা অনীশ্বরবাদী, দ্বৈতবাদী বা অদ্বৈতবাদী, আমাদের একথা একবাক্যে স্বীকার করা উচিত যে আমরা আর যাই হই না কেন অন্ততঃ ধর্মপরায়ণ নই, কখনও নই।

ধর্ম যদি জীবনে প্রযুক্ত হয় তাহলেই তা ধর্ম, তা না হলে ধোঁকা। আমরা কেবল তর্ক, শ্রদ্ধা, কর্মকাণ্ড-পালন এবং দার্শনিক মান্যতার স্তরে ধর্মকে স্বীকার করেই থেমে যাবো না, বাস্তবিকতার স্তরে ধর্মকে জীবনে প্রয়োগ করতে হবে—তাহলেই ধর্ম সম্যক্, কল্যাণকারী এবং মঙ্গলময় হবে।

বিনা কর্ম সম্যক হুএ

জীবন মেঁ উতরে বিনা, ধর্ম ন সম্যক হোয়।
কায়া, বাণী, চিত্তকে, কর্ম ন নির্মল হোয়।।

বোলে গর্ব গুমান সে, মেরা ধর্ম মহান।
সম্প্রদায় কো সমঝতা, ধর্ম মূঢ় নাদান।।

রুঢ়ি অউর পাখণ্ড কে, মিথ্যা সারে কর্ম।
বিনা কর্ম সম্যক হুএ, সম্যক হোয় ন ধর্ম।।

ভিন্ন মতোঁ কী মান্যতা, দর্শন কে সিদ্ধান্ত।
ধর্ম ছুটা, উলঝন বড়ী, সভি হো গয়ে ভ্রান্ত।।

তত্ত্বোঁ কে ব্যাখান মেঁ, গয়ী জিন্দগী বীত।
কোরে বুদ্ধি কিলোল সে, হুয়া না চিত্ত পুনীত।।

সম্যক দর্শন কে বিনা, সম্যক জ্ঞান ন হোয়।
বিন দর্শন বিন জ্ঞান কে, সম্যক চরিত ন হোয়।।

১৭

সত্যই ধর্ম

সত্য ছাড়া ধর্মের আর কি ব্যাখ্যা হতে পারে? সত্যই ধর্ম, অসত্যই অধর্ম। এখানে সত্যে'র অর্থ কেবল বাণীর সত্যতা নয়, 'ধর্ম' শব্দের ন্যায় 'সত্য' শব্দেরও ব্যাপক অর্থ আছে—অর্থাৎ স্বভাব, গুণ, নিয়ম, বিধান। প্রকৃতির নিজস্ব গুণ-স্বভাব আছে। নিয়ম-বিধান আছে। ঐ সকল নিয়ম বিধান এবং ধর্মের সত্যে সমগ্র সজীব নির্জীব চরাচর বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড বাঁধা আছে। এই ব্যাপক অর্থে 'সত্য' এবং 'ধর্ম' পর্যায়বাচী শব্দ। প্রকৃতির স্বভাবের সত্য আমরা যতটা বুঝি এবং স্বীকার করি, আসলে ধর্মকেই ততটা স্বীকার করি। সত্যকে তিন প্রকারে স্বীকার করা যায়। স্বীকারের প্রথম পদক্ষেপ শ্রদ্ধার ভূমিকা দিয়ে শুরু হয়। কোন বুদ্ধ, জ্ঞানী নিজের বোধিজ্ঞান দ্বারা লব্ধ এই সত্যকে শব্দে প্রকাশ করেছেন। আমাদের মনে ঐ মহাপুরুষের প্রতি শ্রদ্ধা জাগে এবং আমরা তাঁর বাণীকে স্বীকার করি। এটা হ'ল শব্দ-সত্যকে স্বীকার করা। কিন্তু শব্দ-সত্যে সত্যের পরিপূর্ণতা হয় না। যখন কোন অনুভূতি-জাত জ্ঞানকে শব্দে ব্যক্ত করা যায়, অর্থাৎ যখন কোন সত্যদ্রষ্টা, ঋতদ্রষ্টা ঋষি তাঁর উপলব্ধ সত্যকে শব্দের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করেন, তখন সত্যের কিছু অংশ নষ্ট হয়ে যায়। এইজন্য শব্দ-সত্য হচ্ছে আংশিক সত্য। কারণ শব্দ এবং ভাষার নিজস্ব সীমা আছে। যে কোন অতি উন্নত ভাষাও আন্তরিক অনুভূতিকে স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করতে অসমর্থ এবং সত্যসন্ধানীর এমন কিছু অনুভূতি থাকে যেগুলো বর্ণনাতীত। শব্দের দ্বারা ওগুলোর বর্ণনা করা যায় না। ওগুলো সম্বন্ধে 'নেতি-নেতি' বলা হয়ে থাকে। বক্তা কেবল এটুকু বলেই থেমে যান যে, ''এরকম তো নয়!

এরকম তো নয়!’’ ত্রি-মাত্রিক জগতে বসবাসকারী ব্যক্তিকে চর্তুমাত্রিক জগতের অভিজ্ঞতা কোন শব্দের মাধ্যমে বোঝানো কি সম্ভব? ইন্দ্রিয়াতীত অবস্থার অনুভূতিকে ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমেই বা কিরূপে বোঝানো সম্ভব? বোঝাবার চেষ্টা করলেও বুঝবে কি করে? অতএব প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তির এই সকল অনুভূতির চর্চা করা কালে ‘না’ বলা ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই। এইরূপ পরম সত্য কখনো শব্দ-সত্য হতে পারে না।

ইন্দ্রিয়াতীত অনুভূতির জন্য শব্দ অসমর্থ তো বটেই, এমনকি ইন্দ্রিয়লব্ধ অনুভূতিগুলোকেও শব্দে যথার্থভাবে প্রকাশ করা যায় না। সূক্ষ্মতর আন্তরিক অনুভূতিগুলো অনেকটা মূক-ব্যক্তির গুড়ের স্বাদ ব্যক্ত করার মতো। ব্যক্ত করার সকল প্রচেষ্টা অসম্পূর্ণই থেকে যায়। ভাষার সীমার বাইরে বক্তা বা লেখকের এবং তার চেয়েও অধিক শ্রোতা বা পাঠকের নিজ নিজ সীমা আছে যা শব্দ-সত্যের পূর্ণ সত্য হওয়ার পথে বাধা সৃষ্টি করে। বক্তা যা বলতে চায় তাকে ঠিক ঠিক বলতে পারলো না, এবং যা বলে তা যে অর্থে বলা হয়েছে শ্রোতা সে অর্থে বুঝলো না—এটাই শব্দ-সত্যের অপূর্ণতা।

কিন্তু, তা হলেও অনুভূতিলব্ধ সত্যকে বাক্যে প্রকাশের চেষ্টা হয়েই থাকে। কোন কোন অংশে শ্রোতার লাভ হয় কোন কোন অংশে ক্ষতি। যেখানে সেগুলোকে খোলা মনে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে সেখানেই লাভ। কিন্তু যেখানে সেগুলোকে পূর্ণ সত্য বলে কট্টর ভাবে মেনে নেওয়া হয়—সেখানে সাম্প্রদায়িক অন্ধবিশ্বাস এবং কুসংস্কার প্রাধান্য লাভ করে। তখন বুঝতে হবে লোকের বুদ্ধিতে যেন তালা পড়েছে, সত্য অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে মানবের প্রগতি রুদ্ধ হয়েছে।

কিন্তু মানুষ তো মনুরই সন্তান, তাই না? অর্থাৎ মন থেকে জাত। মনন-চিন্তন করেই কোন সত্যকে স্বীকার করা তার সহজাত ধর্ম। সাম্প্রদায়িক নেতারা মানুষের চিন্তন-মননের প্রতিভাকে কুণ্ঠিত করে তাকে জড়-ভরত বানিয়ে রাখার হাজার প্রচেষ্টা চালায়। তৎসত্ত্বেও মানব সমাজের একটা প্রবুদ্ধ শ্রেণী শব্দ-সত্যকে পরীক্ষা করার, বুদ্ধির পাল্লায় পরিমাপ করার,

তর্কের মানদণ্ডে যাচাই করার এবং যুক্তির দ্বারা তার সত্যতাকে পরীক্ষা করার কাজে নিরত থাকে। এর দ্বারা সত্যের অন্য এক স্বরূপ জাগ্রত হয়, যাকে বলা হয় অনুমান সত্য বা বুদ্ধিজাত সত্য। সকল সত্যকে বুদ্ধির ভাটিতে উত্তপ্ত করতে হবে। তাকে পরীক্ষার কাজে বুদ্ধি লাগাতে হবে। যুক্তিযুক্ত এবং তর্কসঙ্গত মনে হলেই গ্রহণ করা উচিত। এই নীতির ফলেই সত্যের অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে মানবের প্রগতি আরম্ভ হয়েছে, সকল অন্ধ বিশ্বাস অন্ধ মান্যতা এবং সাম্প্রদায়িক গোঁড়ামির ওপর গভীর আঘাত করা হয়েছে। মানবতা বিকাশের রাস্তা খুলছে। অন্ধ শ্রদ্ধা এবং ভক্তিভাবাবেশের শ্বাসরোধী মহল থেকে এবং শব্দ-সত্যকে সম্পূর্ণ সত্য বলে মেনে নেওয়ার গোঁড়ামিপূর্ণ ঘন কুয়াসা থেকে বাইরে বের হয়ে আসার সাফল্য লাভ হয়েছে। কোন কথাকেই চোখ বন্ধ করে মেনে নেওয়ার প্রবৃত্তি চলে গেছে। 'কেন এরকম?'—এটা জানার ঔৎসুক্য বেড়েছে।

কিন্তু যে প্রকারে শব্দ-সত্যের মান্যতা অধিকতরভাবে অন্ধবিশ্বাস দ্বারা দূষিত হয়ে উঠেছে, সেইরূপ অনুমান বা বুদ্ধিজাত সত্যের মান্যতাও নানাপ্রকার শুষ্ক তর্ক-বিতর্কের ঘন জঙ্গলে পথ হারিয়েছে। শব্দ এবং অনুমানের দ্বারা সত্যের আভাস মাত্রই হতে পারে, অনুভূতি নয়। সত্যের আভাসের অর্থ ধর্মের আভাস। যেখানে ধর্মের আভাস হয় সেখানে ধর্মের নামে ভ্রান্তির উৎপাদন হওয়ারই আশঙ্কা থাকে। সত্যের অনুভূতিই ধর্মের যথার্থ অনুভূতি। অতএব এই দুইয়ের অগ্রবর্তী কল্যাণকারী লক্ষ্য প্রত্যক্ষ সত্যেরই লক্ষ্য। প্রত্যক্ষ সত্য অর্থাৎ স্বানুভূতির স্তরে প্রকট হওয়া সত্য। আধ্যাত্মিক সত্যের সূক্ষ্ম আভ্যন্তরীণ অনুসন্ধানের পথে ইহাই যথার্থ যাত্রা। ইহাই ধর্মের গভীর অনুসন্ধান। এই সকল প্রত্যক্ষ অনুভূতির দ্বারা যতটা সত্যাংশ প্রকাশিত হয়, মানব ধর্মপথে ততটাই এগিয়ে যায়।

কিন্তু অনুভূতির স্তরে সত্যধর্মকে স্বয়ং অন্বেষণ করে—তাকে স্বীকার করা কঠিন কাজ। বরং অন্ধ বিশ্বাসের স্তরে কোন পর-কথনকে স্বীকার করে নেওয়া সহজ। এইজন্য মানব জাতির সুদীর্ঘ ইতিহাসে শব্দ-সত্যের

আধারে অন্ধ-বিশ্বাসী সম্প্রদায়ই সংখ্যায় অধিক। খুব সামান্য লোকই অন্ধবিশ্বাসকে অবজ্ঞ করে বুদ্ধিবৃত্তির প্রয়োগ করতে পেরেছেন। কিন্তু বেশির ভাগ মানুষই অনুভূতির ক্ষেত্রে রিক্ত থাকার দরুন বৌদ্ধিক মত-মতান্তরযুক্ত সম্প্রদায়সমূহের প্রণেতা অথবা অনুগামীই হয়ে থেকে গেছেন; যেখানে অন্তরের অনুভূতি হয় সেখানে সাম্প্রদায়িক ভেদ-ভাবের প্রবণতা কম থাকে। অন্যথায় শব্দ এবং বুদ্ধির স্তরে তর্ক-বিতর্কের ভিন্নতা বিভিন্ন সম্প্রদায়কে পোষণ করে। আন্তরিক অনুভূতিগুলোও নিরপেক্ষ সত্যের শোধনের জন্য হলেই তা শুদ্ধ ধর্মকে বলবান করে, কিন্তু তা যদি পূর্বাগ্রহ পূর্ণ হয় তাহলে তা মত-মতান্তর সমূহেরই প্ররোচনা দেবে।

* * *

প্রকৃতপক্ষে সত্য একটাই। ভিন্ন ভিন্ন কেমন করে হবে? সমগ্র প্রকৃতির বিধান এক-ই, আলাদা-আলাদা কিভাবে হবে? কিন্তু কারও প্রত্যক্ষ অনুভূতিতে প্রকাশিত এই বিধান যখন 'বাণী'র বেশভূষা ধারণ করে তখন এই বেশভূষা ভিন্ন ভিন্ন হয়। ভাষা, শব্দ, বক্তা ভিন্ন হওয়াতে সত্যও ভিন্ন বলে মনে হতে থাকে। যখন কোন ভক্ত কোন মহাপুরুষের দ্বারা অনুভূত সত্যকে স্বয়ং উপলব্ধি না করে অন্ধশ্রদ্ধাবশতঃ ভাবাবেশের স্তরে তাঁর বাণীকেই স্বীকৃতি দিয়ে নিজেকে ধন্য মনে করে—তখন সেই বাণী এবং শব্দসমষ্টির সঙ্গেই সেই ব্যক্তির গভীর আসক্তি হয়ে যাওয়াই স্বাভাবিক। তাঁর কাছে ঐ শব্দ এবং বাণীই সত্য, বাকী সব মিথ্যা। এর থেকেই সম্প্রদায়ের বুনিয়াদ গড়তে শুরু করে। সত্যের সাক্ষাৎকার যিনি করেছেন তিনি কোন সম্প্রদায়ে কিভাবে বাঁধা পড়বেন? কিন্তু যাঁরা কেবলমাত্র শব্দেই বাঁধা পড়েছেন, তাঁরাই সম্প্রদায়কে পোষণ করেন। প্রথম ব্যক্তির জন্য ভাষা একমাত্র মাধ্যম, অতএব সেটা গৌণ। কিন্তু দ্বিতীয়র ক্ষেত্রে ভাষা এবং শব্দই প্রমুখ।

যদি আমি হিন্দু-সম্প্রদায়ের হই তা হলে 'যম-নিয়ম' শব্দের প্রয়োগ দেখে প্রসন্ন হই। বৌদ্ধ হলে 'পঞ্চশীল', জৈন হলে 'অনুব্রত' এবং খৃষ্টান হলে 'টেন কমাণ্ডমেণ্ট্স' শব্দ শুনে গর্বে বুকের ছাতি স্ফীত হয়। কিন্তু

নিজেদের সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তির কারণে ধর্মের বাস্তবিক সত্য জীবনে প্রযুক্ত হ'ল কিনা, শীল-সদাচার জীবনের অঙ্গ হ'ল কিনা — তাকে আমরা কোনও গুরুত্ব দিই না। আমরা কেবল কতকগুলো শব্দকেই 'আমার ধর্ম' 'তোমার ধর্ম' বলে ভাল-মন্দের সংজ্ঞা দিয়ে থাকি।

"সম্যক্ জ্ঞান, সম্যক্ দর্শন, সম্যক্ চরিত্র"—এই শব্দগুলোর প্রয়োগ যে কোন জৈনের কাছে শ্রুতিমধুর, এইভাবে "শীল, সমাধি, প্রজ্ঞা" শব্দগুলো যে কোন বৌদ্ধের কাছে, 'স্থিতপ্রজ্ঞ, অনাসক্ত' শব্দগুলো যে কোন গীতা ভক্তের কাছে এবং 'হোলী, ইন্‌ডিফারেন্স' শব্দগুলো যে কোন খৃষ্টানের কাছে অত্যন্ত প্রিয়। সেই রকম 'ধর্ম' শব্দ শুনলে কারও মনে হয় কানে যেন রূপোর ঘণ্টা বাজছে। আবার ঐ ব্যক্তিরই 'ধম্ম' শব্দ শুনলে মনে হয় বুকের উপর কে যেন মুষলের আঘাত করছে। ঠিক এর বিপরীত হচ্ছে—'ধম্ম' শব্দ শুনলে কারও কাছে মনে হয় যেন দেব দুন্দুভির মতো শ্রুতিমধুর মঙ্গলধ্বনি হচ্ছে। আবার তাঁকেই 'ধর্ম' শব্দ যেন কাঁটা দিয়ে বিদ্ধ করে। শব্দের সঙ্গে আমরা কেমন আসক্তি উৎপন্ন করে ফেলেছি। এই কারণে এদের অর্থের প্রতি ধ্যান যায় না, এবং ধ্যান গেলেও সেটা নিরর্থক হবে—যদি সেই অর্থকে জীবনে প্রয়োগ করা না যায়। সম্প্রদায় এবং ধর্মের মধ্যে ইহাই মৌলিক পার্থক্য। সম্প্রদায় কতকগুলো শব্দকেই গুরুত্ব দেয়, আর ধর্ম সেগুলোর অর্থকে, এবং সেই অর্থকে ধারণ করাকেই গুরুত্ব দেয়। আমরা নিজেদেরকে যতই অসাম্প্রদায়িক বলি না কেন, এটাই সত্য যে আমাদের কাছে সম্প্রদায়ই মুখ্য হয়ে গেছে। এইজন্য আমাদের কাছে শব্দই মুখ্য, অর্থ গৌণ। প্রত্যক্ষ অনুভূতি তো লুপ্তপ্রায় হয়ে গেছে। যাকেই দেখুন না কেন, দেখবেন যে সে শব্দ-সত্যের পেছনেই পাগল। খুব অল্প লোকই আছেন যাঁরা অনুমান সত্যের দিকে এগিয়েছেন। প্রত্যক্ষ সত্য পর্যন্ত যাওয়ার কারও ফুরসতই নেই এবং কেউ তা আবশ্যক বলেও অনুভব করেন না।

আমরা যারা হিন্দু আমাদের চিত্ত হৃষ্ট হয় যখন দেখি যে কোন অ-হিন্দু গীতার কোন শ্লোক নিজের ভাষণে উদ্ধৃত করছেন। সেই রকম

আমরা যারা বৌদ্ধ বা জৈন, আমাদের হৃদয়তন্ত্রীর তার যেন বাজতে থাকে যখন দেখি যে কোন অবৌদ্ধ বা অজৈন ধম্মপদ বা মহাবীরের বাণী নিজের ভাষণে উদ্ধৃত করছেন! নিজ নিজ সম্প্রদায়ের বাণীর প্রতি আমরা কিরূপ আসক্ত হয়ে পড়েছি। যে পরম্পরা এবং পরিবেশে আমরা জন্মেছি ও পালিত হয়েছি তার ধর্মগ্রন্থের প্রতি শ্রদ্ধা, আদর এবং অনুরাগ হওয়াতে কোন দোষ নেই, কারণ তার থেকে আমরা প্রেরণা এবং মার্গদর্শন পেয়ে থাকি। কিন্তু দোষ হচ্ছে আসক্তিতে। যদি ঐ সত্যকে কোন অন্য সম্প্রদায়ের লোক নিজের ভাষায় বলে এবং নিজেদের মহাপুরুষ দ্বারা কথিত বলে ব্যক্ত করে, ঐ আসক্তির কারণে আমাদের মন কি রকম খারাপ হয়ে যায়। সত্যকেও তখন পর পর মনে হয়। এই আসক্তির মুখ্য কারণ আমাদের শ্রদ্ধা বন্ধ্যা হয়ে গেছে। তার কোন ফল ফলেনি। আমরা নিজেদের ধর্মগ্রন্থের সত্যকে কেবল শ্রদ্ধা পর্যন্তই সীমিত রেখেছি, নিজ অনুভূতির দ্বারা তার স্বাদ চেখে দেখিনি। অতএব আমাদের জন্য তো সর্বদা শব্দই সত্য রয়ে গেছে। আর যে শব্দে এই সত্য ব্যক্ত হয়েছে তা আমাদের পরম্পরার নয়, এইজন্য আমাদের কাছে শব্দ সাথে সাথে সত্যও পর হয়ে গেছে। কিন্তু যখন আমরা ঐ সত্যকে স্বয়ং সাক্ষাৎ করি তখন তাতে আর 'পরত্ব' থাকে না। সত্য তো সত্যই, সত্য আবার আলাদা আলাদা কেমন করে হয়? সংস্কৃত, পালি, প্রাকৃত, হিব্রু, আরবী প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষার শব্দ শব্দ-সত্য স্বীকারকারীর কাছে আলাদা আলাদা লাগবে। কিন্তু যদি এর থেকে একটু আগে এগিয়ে যান এবং একটু বুদ্ধিপ্রয়োগ করেন, তাহলে এই বুদ্ধিজাত অনুমান-সত্য কোন জটিলতাকে উন্মোচিত করতে সহায়ক হবে। সত্যের সহিত সম্বন্ধ রক্ষা করলে অনেক বিভিন্নতা দূর হবে। কিন্তু যখন সত্য নিজের অনুভূতিতে অবতরণ করতে শুরু করবে, তখন সত্যের সমস্ত বিভিন্নতা আস্তে আস্তে দূর হবেই। অনুভূতি যদি পূর্ব সংস্কারের প্রভাব মুক্ত হয় এবং তা কেবল সত্যের অনুসন্ধানের জন্যই প্রযুক্ত হয় তবে বিভিন্ন সত্যের মধ্যে বিভেদ দেখা দেবে না।

সত্য নিজেরও নয়, অন্যেরও নয়। পুরাণোও নয়, নতুনও নয়। বৃদ্ধও নয়, যুবকও নয়। বর্মীও নয়, ভারতীয়ও নয়। হিন্দুও নয়, মুসলমানও নয়। সত্য সত্যই—সর্বদা একরকম, সর্বত্র একরকম। কিন্তু কোন বিশ্বাসকে যখন মিথ্যা কল্পনার উপর আশ্রিত করে সত্য বলে মানতে শুরু করি, তখন বিভিন্নতা আসবেই। নিরপেক্ষ অনুভূতিলব্ধ সত্যে কোন ভেদ থাকে না। শব্দসত্য এবং অনুমান-সত্যের সীমাকে অতিক্রম করে যখন আমরা প্রত্যক্ষ সত্যকে গুরুত্ব দিতে শুরু করি, তখন মিথ্যা কল্পনার শিকড়গুলি আলগা হতে শুরু করে। শুদ্ধ ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হতে শুরু করে। অনুভূতির স্তরে যাকে লাভ করা যায় তাই সত্য—এটা মেনে নিয়ে চলাই ধর্মপথে চলা; সত্য, জ্ঞান এবং মুক্তির পথে চলা। এরূপ অবস্থায় অন্ধবিশ্বাস টিকতে পারে না। অসত্য এবং মিথ্যা জন্মাতে পারে না। সত্য ধর্ম অনুসন্ধানেরই বিষয়, অন্ধ অনুকরণের নয়।

কিন্তু যেখানে সম্প্রদায় সমৃদ্ধ হয় সেখানে সাম্প্রদায়িক নেতা সত্যকে কাছে ঘেঁষতে দেয় না। সত্যকে তর্কের মানদণ্ডে যাচাই করতেও দেয় না। তাকে অনুভূতির স্তরে নিয়ে আসা তো দূরের কথা। বলা হয় যে ধর্মে বুদ্ধিবিচারের কোন স্থান নেই! এটা আবার কিরকম ধর্ম যেখানে বুদ্ধিবিচারের স্থান নেই? বিনা বুদ্ধি-বিচার, বিনা বোধির ধর্ম, ধর্ম কেমন করে হয়? হাঁ, এটা ঠিক যে সম্প্রদায়ে বুদ্ধি-বিচারের স্থান নেই, কেননা বুদ্ধি-বিচার এলেই সম্প্রদায় টুকরো টুকরো হয়ে যায়। সেখানে তো অন্ধ বিশ্বাসই প্রাধান্য লাভ করে, মিথ্যার ধরাতলে অধর্মই তো বৃদ্ধি করে, ধর্ম শ্রীবৃদ্ধি লাভ করতে পারে না। যখন মানুষ নিজের বুদ্ধিবৃত্তিকে অবরুদ্ধ করে ফেলে তখন সত্যের অনুসন্ধান আপনা থেকেই বন্ধ হয়ে যায়। ধর্মের পা কেটে যায়, চোখ অন্ধ হয়, সে খোঁড়া এবং অন্ধ হয়ে সম্প্রদায়ে পরিণত হয়। যখনই 'গুরু-বচনই সত্য'—এই গুরুবাদ মানুষের সামনে দেওয়াল হয়ে দাঁড়িয়ে গেছে, সে তখনই সত্যের অনুসন্ধান করা ছেড়েছে।

যে কোনও সংকীর্ণবুদ্ধিসম্পন্ন সাম্প্রদায়িক নেতার এই ভয় সব সময় থাকে —''আমার খোঁয়াড়ের একটি ভেড়াও যেন বেড়া ভেঙে অন্য খোঁয়াড়ে

না যায়। আমার সকল অনুগামী যেন ভেড়া-ছাগল ও গাই-বলদের মতো অন্ধ অনুকরণকারী স্বভাবসম্পন্ন হয়ে থাকে।" সেজন্য তিনি তাদেরকে নিজের সাম্প্রদায়িক বিশ্বাসের কড়া মদ খাইয়ে রাখেন। অনেক অদ্ভুত এবং অসঙ্গত কথাকে স্বীকার করে নেওয়ার জন্য বাধ্য করে রাখেন। না মানলে নানা নারকীয় যন্ত্রণার আতঙ্কে ভীত করেন, এবং মানলে মুক্তি-মোক্ষের আশায় প্রলুব্ধ করে রাখেন। তাঁর মনোভাব হ'ল, ধর্ম যায় যাক, সম্প্রদায় যেন বেঁচে থাকে। কী দশা এই মনু-পুত্রদের? মনন-চিন্তনের স্বভাব হারিয়ে এরা অন্ধসম্প্রদায়ের ভূত নিজেদের ঘাড়ে চাপিয়ে নিয়েছে! আমরা নিজেদের ধর্মগ্রন্থকে না বুঝেও সত্য বলে মানি, আর অন্য সম্প্রদায়ের ধর্মগ্রন্থকে না পড়েও অসত্য বলে মনে করি—এরূপ ভাবাবেশ আমাদের ভেতরে ছেয়ে গেছে। ধর্মের সঙ্গে আমাদের কোন লেনদেনই নেই। আমাদের কাছে সম্প্রদায়ই প্রমুখ। একেবারে নিকৃষ্ট অধার্মিক দুরাচারী ব্যক্তিও যদি আমাদের সম্প্রদায়ে থাকে—দোষ নেই, কিন্তু অতি উত্তম ধার্মিক সদাচারী ব্যক্তি যদি অন্য সম্প্রদায়ের হয়, সে আমাদের চক্ষুশূল।

আমরা মা-বাবার কাছ থেকে যেমন আকৃতি চেহারা, বুলি-ভাষা পেয়ে থাকি, তেমনি পেয়ে থাকি অন্ধবিশ্বাস এবং অন্ধ মান্যতা। পেয়ে থাকি অন্ধভক্তির ভাবাবেশ। আরও পেয়ে থাকি সাম্প্রদায়িকতার সেই আতঙ্ক এবং প্রলোভন যা আমাদের সকল অন্ধ বিশ্বাসের বন্ধনকে মজবুত বানায়। তবে সঙ্গে সঙ্গে মানবীয় বৌদ্ধিক সম্পদের বীজও পেয়ে থাকি। আমরা মা-বাবার কাছ থেকে পাওয়া আকৃতি বদলাতে পারি না, কিন্তু এই সকল সাম্প্রদায়িক মান্যতাকে নিজের বুদ্ধি প্রয়োগের দ্বারা এবং নিজের অনুভূতির বলে বদলাতে পারি! যেগুলো কাজের সেগুলোকে রাখতে পারি এবং যেগুলো অকাজের সেগুলোর মূল উৎপাটন করতে পারি। বুদ্ধির মোটেই প্রয়োগ না করলে এবং নিজ অনুভূতির একটুও অভ্যাস না করলে, না বুঝেই সেই অন্ধ মান্যতাকে নিজের আকৃতি-চেহারার মতো যথাযথ ভাবে রেখে দেবার প্রচেষ্টা অবাধ গতিতে চলতে থাকবে।

সত্য ধর্মের অনুসন্ধানে অন্ধ বিশ্বাসের সঙ্গে কোন সমঝোতা হতে পারে না। যেখানে অন্ধ বিশ্বাসের আগ্রহ আছে, সেখানে ধর্ম নেই, আছে শুধু সম্প্রদায়। আর বুঝতে হবে যে কেউ স্বার্থের কারণে বা অজ্ঞানতার বশবর্ত্তী হয়ে আমাদের নিজের খোঁয়াড়ে বেঁধে রাখতে চায়। সত্য এবং ধর্ম লাভ করার জন্য বিচার, আলোচনা এবং বাণীর স্বাতন্ত্র্য নিতান্ত আবশ্যক। তার চেয়েও বেশী আবশ্যক হচ্ছে প্রত্যক্ষ অনুভূতির অভ্যাস। এদের যদি শৃঙ্খলিত বা আবদ্ধ করে রাখি, বুঝতে হবে আমরা সত্য এবং ধর্ম থেকে অনেক দূরে সরে গেছি।

অনুমান এবং প্রত্যক্ষ-সত্যের মেলবন্ধন বড়ই কল্যাণময়। যা অনুভব করবে তাকে বৌদ্ধিক স্তরে বুঝতে হবে এবং যাকে বৌদ্ধিক স্তরে বুঝবে, তাকে অনুভূতির স্তরে জানতে হবে—এটাই সত্যের অনুসন্ধান। যদি আমরা শব্দ-সত্যকে খোলা মনে কাজে লাগাতে পারি তখন তা সত্যের অনুসন্ধানে ভূমিকা এবং মার্গদর্শনের কাজ করে। কিন্তু যখন সত্যান্বেষী কোন পূর্ব-মান্যতাতে আস্থাবান হ'য়ে থাকেন, তখন সত্যানুসন্ধান রুদ্ধ হয়ে যায়। আবার সারা জীবন ধরে যেন-তেন-প্রকারেণ তার নিজের মান্যতাকেই সত্যসিদ্ধ করাতে সব পরিশ্রম লাগিয়ে দেন।

যদি কোন মহাপুরুষের অনুভূতি-সিদ্ধ বাণী হয়, তাকে আমাদের বুদ্ধির মানদণ্ডে পরখ করে দেখা থাকে, এবং যদি তারই আধারে আমাদের প্রত্যক্ষ অনুভূতির অভ্যাস চলতে থাকে, তাহলে সত্যধর্মের রথ ঠিক পথে চলে আমাদের গন্তব্যস্থলে পৌঁছে দেয়। সত্যের এই তিনটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গকে ঠিক ভাবে ব্যবহার করতে পারলে আমরা অসত্য থেকে সত্যের দিকে, অজ্ঞান থেকে জ্ঞানের দিকে, বন্ধন থেকে মুক্তির দিকে এগিয়ে যেতে পারবো। এতেই আমাদের সকলের কল্যাণ ও মঙ্গল নিহিত আছে।

সত্য সনাতন এক

সত্য ন দূজা হো সকে, সত্য সনাতন এক।
বিন দর্শন বিন জ্ঞান কে, কল্পিত হুএ অনেক।।

শুদ্ধ সত্য হী ধর্ম হ্যয়, অনৃত ধর্ম ন হোয়।
জঁহা পনপতি কল্পনা, ধর্ম তিরোহিত হোয়।।

মনন করে চিন্তন করে, য়হী মনুজ কা ধর্ম।
আখঁ মুঁদ পিছে চলে, য়হ পশুয়োঁ কা কর্ম।।

শব্দ বিচারা ক্যয়া করে? অর্থ ন সমঝে কোয়।
অর্থ বিচারা ক্যয়া করে? ধারণ করে ন কোয়।।

অপনে অপনে গ্রন্থ্ সে, হুয়া অমিত অনুরাগ।
গ্রন্থি বন গয়ে গ্রন্থ্ হী, মনুজ বড়া হতভাগ।।

গীতা হো য়া বাইবেল, আগম ত্রিপিটক হোয়।
বোধি বচন হোওয়ে জহাঁ, বুদ্ধ বচন হী হোয়।।

১৮
ধর্ম-দর্শন

ধর্ম-দর্শন মানে সত্যদর্শন। যেখানে দর্শনের অর্থ ফিলসফী নয়, তত্ত্ব বিবেচনা নয়, বা কোন রূপ-আকৃতিকে দেখা নয়। এখানে দর্শনের অর্থ হচ্ছে প্রত্যক্ষ সত্যের স্বানুভূতি। জীব-জগতের সত্যকে, প্রকৃতির সর্বব্যাপী বিধানকে প্রত্যক্ষানুভূতির দ্বারা জানাই ধর্মদর্শন, সত্যদর্শন।

দুঃখ থেকে মুক্তি পাবার জন্য ধর্ম, আর দর্শন হচ্ছে তার বৈজ্ঞানিক অভ্যাস। প্রকৃতির যে সকল নিয়ম আমাদের উপর প্রতি মুহূর্তে ক্রিয়াশীল, যেগুলোর সঙ্গে আমাদের সরাসরি সম্বন্ধ সেগুলোকে জানা, বোঝা, গ্রহণ করা এবং নিজেকে সেগুলোর অনুকূল করে তোলা—এটাই ধর্ম-দর্শনের উদ্দেশ্য। দর্শনের অভ্যাস দ্বারা এতে আমরা যতটা পরিপক্ক হই ততটাই আমরা ধর্মে প্রতিষ্ঠিত হই, সুখ-শান্তির যথার্থ অধিকারী হই। ধর্ম-দর্শনের অভ্যাস আমাদের আধ্যাত্মিক উত্থানের সোপান-পথ।

প্রকৃতির যে সকল নিয়মের সঙ্গে আমাদের দুঃখ এবং দুঃখমুক্তির, বন্ধন এবং বন্ধনমুক্তির সোজাসুজি সম্বন্ধ, সেগুলোকে জানা এবং জেনে সেগুলোকে নিজের ভালোর জন্যে ব্যবহার করাই ধর্ম। যেটা দুঃখের কারণ তাকে নিবারিত করা, এবং যেটা দুঃখ বিমুক্তির উপায় তাকে ধারণ করা—এটাই সর্বব্যাপী বিধানের প্রতি সমন্বয়কারী আত্মহিত বা সর্বহিতকারী ধর্ম। প্রকৃতির কারণ-কার্য রূপ বিধান সকলের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। এই বিধান কারও উপর কোপও করে না, কৃপাও করে না। প্রকৃতি কাউকে রেহাই দেয় না। যে আইন ভাঙে সে দণ্ডিত হয়, যে আইন পালন করে সে পুরস্কৃত হয়। অগ্নির ধর্ম হচ্ছে জ্বালানো—এটাই প্রকৃতির বিধান। আমরা অজ্ঞানতাবশতঃ যদি অগ্নির দুর্ব্যবহার করি তাহলে এর দ্বারা

নিজেরও ক্ষতি এবং অন্যদেরও ক্ষতি হবে। আর সদ্ব্যবহার করলে এর দ্বারা পরিপূর্ণভাবে উপকৃত হই। আমাদের দুঃখ অথবা দুঃখনিরোধ আমাদের অজ্ঞান এবং জ্ঞানের উপর নির্ভর করে। নির্গুণ, নিরাকার, ব্যক্তিত্ব-বিহীন, সর্বব্যাপী, অনন্ত বিশ্ববিধান বা বিশ্বধর্মে কারও প্রতি কোন পক্ষপাতের ভাব নেই। এই বিধান সকলের উপরে সমানভাবে প্রযুক্ত হয়। যে এতে একাত্মতা লাভ করেছে সে দুঃখমুক্ত হয়েছে। যতটা একাত্মতা লাভ করেছে ততটা দুঃখমুক্ত হয়েছে। যতদিন না আমরা এই সত্যকে ঠিক ভাবে বুঝতে পারবো ততদিন আমরা বিপথগামী হয়ে নিজেরই ক্ষতি করবো। আর ঠিক ঠিক বুঝতে পারলে বিপথগমন রুদ্ধ হবে। অতএব বিধান অর্থাৎ ধর্ম পালনের প্রয়াসে লেগে পড়ুন এবং অজ্ঞানবশতঃ বিধান-বিরুদ্ধ কর্মের আচরণের ফলে যে কষ্ট পাচ্ছেন তা' থেকে মুক্ত হোন।

জীবন যাপনের স্থূল অঙ্গ, যথা খাওয়া-দাওয়া ইত্যাদির সঙ্গে সম্বন্ধ যুক্ত যে সব প্রাকৃতিক নিয়ম আছে, সেগুলোকে বুঝে এবং সেই অনুসারে চলে আমরা শরীরকে সুস্থ রাখি। ঠিক সেই রকম সূক্ষ্মতর স্তরে যে নিয়ম আছে তাকে জেনে বুঝে এবং পালন করে আমরা অন্তরের সুখ-শান্তি আয়ত্ত করতে পারি।

রোগের কারণ না জানলে তার প্রতিকার করাও অসম্ভব। প্রতিকার করতে গিয়ে এমন নতুন জটিলতা তৈরী হ'ল যার সঙ্গে আসল রোগের কোন সম্বন্ধই নেই। এই অজ্ঞানতাই আমাদের রোগমুক্ত হতে দেয় না। রোগের যথার্থ কারণ জানা গেলে, এবং সেই কারণকে নিবারিত করার প্রয়াসে লেগে গেলে রোগমুক্ত হওয়ার পথে কোন সংশয় থাকে না।

যখন মানবীয় জ্ঞান এবং প্রতিভা শৈশব অবস্থাতে ছিল, তখন বিস্ময়-বিমূঢ় মানব প্রকৃতির বিভিন্ন রূপের রহস্য অবাক্ হয়ে দেখতো। প্রকৃতির সৌম্য স্বরূপ দেখে মুগ্ধ হয়ে যেতো, আর প্রচণ্ড রূপ দেখে ভীত হয়ে যেতো। যথার্থ কারণ না জানায় সেই অবস্থাতে ভীত মানব কল্পনা করল—কোন অদৃশ্য দেবতার প্রকোপে প্রকৃতির ধ্বংসলীলা চলছে। এবং

নিজের সুরক্ষার জন্য সেই অদৃশ্য দেবতাকে প্রসন্ন করার চেষ্টায় মেতে উঠলো, তাঁর প্রশংসায় গীত গাইল, পূজা অর্চনা করল, শুধু অন্ন-বলি নয়, নিরীহ-নিরপরাধ পশু এবং মানুষদেরও বলিদান করে ধরিত্রীকে রক্ত-রঞ্জিত করল। আসল কারণই যখন জানলো না, রোগের প্রতিকার কি করে হবে? যখন কয়েকজন মানুষ এই সকল অন্ধবিশ্বাসকে অবহেলা করে সত্যের খোঁজ করল, তখন নিজের শ্রমের সমুচিত ফলও পেল। তারা প্রকৃতির যথার্থ সত্যের রহস্য খুঁজে বের করল। প্লেগ, কলেরা, বসন্ত প্রভৃতি মহামারীর যথার্থ কারণ আবিষ্কার করল। মেধাবী মানব এই ব্যাধিগুলোকে নির্মূল করার জন্য সমগ্র শক্তি নিয়োজিত করল। দুর্ভিক্ষ এবং বন্যার তাণ্ডবলীলা দেখে অসহায়ের মত হাত জোড় করে বসে না থেকে নিজেদের বুদ্ধি এবং পুরুষার্থকে কাজে লাগালো। নদীতে বাঁধ দিল। সত্যসন্ধানী এই মানব-মনীষীরা এইভাবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অন্ধবিশ্বাসের মূল উৎপাটিত করে জাতির সুখ-সমৃদ্ধি সাধনের কাজে লেগে গেল। মানবের এই সত্যানুসন্ধানের অভিযান বাস্তবিকই প্রশংসনীয়। সে আজ অন্তরীক্ষকে পরিমাপ করার জন্য নিজের ক্ষুদ্র পদক্ষেপে এগিয়ে যাচ্ছে।

কিন্তু, এই বাহ্যিক অন্বেষণ অপেক্ষা অধিক আবশ্যক এবং গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে নিজের অন্তরের অন্তরীক্ষের অন্বেষণ, নিজের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত প্রকৃতির যে সত্য, সেই সত্যের খোঁজ—যার কারণে আমরা দুঃখ-সন্তপ্ত হই এবং যাদের দ্বারা আমরা দুঃখমুক্ত হতে পারি। একে না জানার ফলেই আমাদের দৈনন্দিন জীবনে দুঃখকষ্টের কারণ স্বরূপ আমরা নানা দেব দেবী এবং ঈশ্বরের রোষের কথা কল্পনা করি, এবং মনে করি এঁদের তুষ্ট করতে পারলেই আমাদের দুঃখমুক্তি ঘটবে। এই জন্যই যখনই কোন ছোট বা বড় দুঃখের সম্মুখীন হই, তখনই আমরা অবোধ এবং ভীত মানসিক অবস্থায় এঁদের নামে মানত করি, এঁদের উদ্দেশ্যে পুজো দিই, তীর্থ করতে যাই এবং এঁদের অতিশয়োক্তিপূর্ণ প্রশংসাসূচক স্তবগুলো পাঠ করি। এই সকল কল্পিত বিধাতাদের প্রসন্ন করার জন্য অগণিত কর্মকাণ্ডের সৃজন এবং পালন করি।

কিন্তু মানবজাতির মধ্যে এমন প্রবুদ্ধ শ্রেণীও আছেন যাঁরা আন্তরিক সত্যের সন্ধানে নিজেদের নিযুক্ত করেছেন। যুগে যুগে অনেক ঋষি, মুনি,

সন্ত, জ্ঞানী, বুদ্ধ, জিন হয়েছেন যাঁরা অন্তরের অন্তরীক্ষকে খোঁজ করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, আমাদের দুঃখের মূল কারণ এবং সেগুলোকে উৎপাটিত করার উপায় আমাদের ভেতরেই আছে, বাইরের কোথাও নয়। তাঁরা দেখেছেন যে, মানুষের চিত্তপ্রবাহ যখন ক্রোধ, ঈর্ষা, ভয়, বাসনা, মাৎসর্য প্রভৃতি বিকারের দ্বারা বিকৃত হয় তখন আমরা দুঃখ সন্তপ্ত হয়ে উঠি এবং যদি এ সকল বিকার দূর হয়, তখন দুঃখ থেকে বিমুক্ত হই। তাঁরা এটাও অনুসন্ধান করেছেন—আচ্ছা, এই বিকারই বা কেন উৎপন্ন হয়? উত্তরও তাঁরা পেয়েছেন যে সমস্ত বিকারের জননী হচ্ছে তৃষ্ণা—প্রিয়কে পাবার জন্য তৃষ্ণা, অপ্রিয়কে দূর করার তৃষ্ণা। আমাদের ভেতরে যখন প্রিয়-সুখদ সংবেদনা উৎপন্ন হয় তখন আসক্তি-রূপী তৃষ্ণা জাগে, আবার যখন অপ্রিয়-দুঃখদ সংবেদনা উৎপন্ন হয়—তখন দ্বেষরূপী তৃষ্ণা জাগে। আরও অনুসন্ধান চললো। তাঁরা জানতে চাইলেন প্রিয়-অপ্রিয় সুখদ-দুঃখদ সংবেদনা কেন উৎপন্ন হয়? তাঁরা দেখলেন যে যখন চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্ এবং মন—এই ছয়টি ইন্দ্রিয়ের সহিত এদের নিজ নিজ বিষয়—রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস, স্পর্শ এবং চিন্তনের সংস্পর্শ-সংঘাত হয়, তখনই ভেতরে শরীর এবং চিত্তস্কন্ধে বিভিন্ন প্রকার অগণিত সূক্ষ্ম তরঙ্গ উৎপন্ন হয় এবং নিজেদের পূর্ব সংস্কার এবং অনুভূতি আধারে আমরা সেগুলোকে প্রিয় বা অপ্রিয় সংজ্ঞা দিয়ে থাকি। তাঁরা আরও দেখেছেন যে যখন চোখ, কান, নাক ও জিভের সঙ্গে তাদের বিষয়গুলোর সংস্পর্শ হয় না, এবং সেই কারণে স্পর্শজনিত সংবেদনাও উৎপন্ন হয় না, তখনও আমরা যতদিন জীবিত থাকি ততদিন শরীর ও মনের স্তরে প্রতিমুহূর্তেই পারস্পরিক স্পর্শজনিত কারণে সংবেদনা উৎপন্ন হতে থাকে এবং এগুলোকে প্রিয় বা অপ্রিয় মনে করে আমরা আসক্তি অথবা বিদ্বেষের প্রতিক্রিয়া করতে থাকি। তাঁরা আরও দেখেছেন যে সমস্ত প্রপঞ্চই অন্তর্মনের সেই স্তরে চলতে থাকে যে স্তরে আমাদের হুঁশই থাকে না, অর্থাৎ আমরা বুঝতেই পারি না কখন স্পর্শ হয়েছে এবং পরিণাম স্বরূপ কখন সংবেদনা জেগেছে এবং তারই প্রতিক্রিয়া স্বরূপ কখন আমরা

আসক্তি-বিদ্বেষের স্রোতে ডুবে গেছি, কখন মানসিক পীড়ন ও উত্তেজনার গিঁট বাঁধতে সুরু করেছি এবং দুঃখ পুঞ্জীভূত হতে শুরু করেছে। তাঁরা উপলব্ধি করেছেন যে উপরে উপরে তথাকথিত হুঁশ থাকলেও ভেতরে আসলে অচেতনতা, অজ্ঞান, অবিদ্যা এবং মোহের বশে আমরা এই চিত্তপ্রবাহে প্রতিমুহূর্তে আসক্তি-বিদ্বেষের কলুষ প্রবাহিত করতে থাকি — যেমন গলিত ক্ষত থেকে অনবরত পুঁজ-প্রবাহ চলতে থাকে। ফলে আমরা সর্বদা দুঃখ-মগ্নই থাকি।

ঐ সকল মহাপুরুষদের অন্বেষণ চলতেই থাকে। তাঁরা দেখলেন যে, যে মুহূর্তে ব্যক্তি অন্তর্মনের গভীরতম স্তর পর্যন্ত জাগ্রত থাকে, অপ্রমত্ত থাকে, অজ্ঞান-অবিদ্যা-মোহ থেকে মুক্ত থাকে, এই অনিত্য-প্রবাহকে নির্লিপ্ত অনাসক্তভাবে দেখতে থাকে — সেই মুহূর্তে চিত্তপ্রবাহে নতুন আসক্তি বা বিদ্বেষ উৎপন্ন হয় না। পরিণামস্বরূপ পুরাণো আস্রব (বিকার) ক্ষীণ হয়। পূর্বসঞ্চিত কলুষ বিনষ্ট হয়। তাঁরা দেখেছেন যে বারে বারে এই সমতাময়ী সচেতনতার অভ্যাসের দ্বারা চিত্তপ্রবাহ বিশুদ্ধ হয় এবং যতটা বিশুদ্ধ হয় ততটা স্বতঃই সদ্‌গুণসম্পন্ন হয়। যখন একেবারে বিশুদ্ধ হয়, তখন সর্বথা সদ্‌গুণসম্পন্ন হয়।

এইভাবে নিজ অনুভূতির সাহায্যে সেই সত্যদ্রষ্টা ঋষিগণ দেখেছেন রোগের মূলীভূত কারণ কি এবং তা নিবারণের উপায় কি? প্রকৃতি নিজে সমস্ত রহস্য এঁদের কাছে খুলে দিয়েছে। তাঁরা দেখেছেন যে সত্য অনুসন্ধানের এই প্রক্রিয়াতে তাঁরা নিজেদের চিত্তধারাকে আস্রব এবং কলুষ থেকে মুক্ত করতে পেরেছেন। তাঁরা জেনেছেন যে, যে ব্যক্তি এই অন্তর্নিরীক্ষণ ও আত্মদর্শনের প্রক্রিয়াকে আয়ত্ত করেছেন সেই ব্যক্তি নির্মলচিত্ত হয়ে দুঃখ-বিমুক্ত হয়েছেন। সত্য অনুসন্ধানের এই প্রত্যক্ষ লাভ মানব জাতির অনেক বড় উপলব্ধি।

কখনও কখনও এই প্রশ্ন জাগে যে, যেমন বাহ্য ভৌতিক জগতের বৈজ্ঞানিকগণ যে গবেষণা করেছেন তার ফলভোগ করার জন্য আমরা তাঁদের কৃত গবেষণাকে অনুসরণ না করে সোজাসুজি তাঁরা যে আবিষ্কার

করেছেন তারই ফল ভোগ করি, সেই রূপ এই আন্তরিক চৈতসিক জগতের গবেষণালব্ধ ফলের ভাগীদার আমরা হতে পারবো না কেন? আমাদের উচিত মহাপুরুষেরা যে সত্যের অনুসন্ধান করেছেন তাকে মেনে নেওয়া। তাতে শ্রদ্ধা উৎপন্ন করা। এতেই কাজ হয়ে যায়। আমাদের মধ্যে প্রত্যেক ব্যক্তি কেন এই সত্যসন্ধানের প্রক্রিয়াতে স্বয়ং নিযুক্ত হবে? কেন ধর্ম-দর্শনের অভ্যাস স্বয়ং করবে? উত্তর হচ্ছে এই যে, এই অনুসন্ধান প্রক্রিয়াই তো তাঁদের গবেষণার বিষয় ছিল। এটাই তো আমাদের রোগের চিকিৎসা। যতদিন পর্যন্ত কেউ স্বয়ং আত্মনিরীক্ষণ না করবে ততদিন সে দুঃখ-মুক্ত হতে পারবে না। নিজের চিত্তবিকারকে নিজেই উপলব্ধি করে ওদের মূলোৎপাটন করা সম্ভব। এটাই তো সেই ঔষধ যাকে সেবন করতেই হবে। যেমন কোন চিকিৎসাশাস্ত্রের বৈজ্ঞানিক গবেষণা করে দেখেছেন যে ম্যালেরিয়া রোগের অমুক কারণ এবং তার চিকিৎসার ঔষধ হচ্ছে কুইনাইন। এখন কুইনাইন যতই উপকারী হোক না কেন ম্যালেরিয়া রোগী স্বয়ং সে কুইনাইন না খেলে সে রোগমুক্ত হতে পারবে না। সেই রূপ নানাভাবে নানাপথে গবেষণা করে এই শ্রেয়ার্থী সাধকগণ ধর্মদর্শনের ঔষধ আবিষ্কার করেছেন—যতই ফলদায়িনী ঔষধ হোক এর সেবন অনিবার্য। সে সকল শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত মহাপুরুষগণের তো এটা মহা কৃপা যে তাঁরা রাস্তা বের করে দিয়েছেন। গন্তব্যস্থলে যেতে হলে সেই রাস্তা দিয়ে আমাদেরই চলতে হবে। কেউ নিজের কাঁধে চাপিয়ে কাউকে গন্তব্যস্থলে পৌঁছিয়ে দেবে না। 'নিজের মুক্তি নিজেরই হাতে' এই সত্যকে স্বীকার করার অর্থ অহংকারী হওয়া নয়, বরং বিনীত ভাবে নিজের দায়িত্বকে স্বীকার করা।

সাধকগণ! আমি নিজের এবং আমার পরিচিত হাজার হাজার সাধকের অনুভূতিকে ভিত্তি করে বলছি যে, এই প্রক্রিয়ার চর্চাপথে কোন অলৌকিক চমৎকার নেই। যেটা উপলব্ধ হয় সেটা স্বয়ং নিজের কঠোর পরিশ্রমের দ্বারাই হয়েই থাকে। আমাদের মনরূপ বস্ত্রটি কলুষিত। আমাদের সৌভাগ্য এই যে এই উত্তম বিধিকে আমরা সাবান স্বরূপ পেয়েছি। আমরা এই

সাবান যতটা প্রয়োগ করবো, ততটাই ময়লা দূর হবে, বেশী নয়। যতটা ময়লা থেকে যাবে ততটাই দুঃখ ভোগ করতে হবে। কোন কাজ করবো না অথবা একটু করে করবো, অথচ চাইবো সব ময়লা ধুয়ে যাক — এরকম কোন জাদু এতে নেই। বস্তুতঃ এটা সারা জীবনের কাজ। সারা জীবন নিজেই নিজের প্রতি সজাগ সচেতন থাকতে হবে। অপ্রমত্ত থাকতে হবে। এটা সত্য কথা যে, কাজটি খুবই কঠিন। কিন্তু অন্য কোন পথও তো নেই।

কিন্তু আমাদের অজ্ঞানতা বশতঃ আমরা এমন এক রাস্তা খুঁজি যার সাহায্যে আমরা কোন পরিশ্রম না করেও সাফল্য লাভ করতে পারি। এই অবস্থাতে আমরা আবার কল্পনার জগতে চলে যাই। এতজন মনীষী যে পরম সত্যের সন্ধান পেয়েছেন—তাতে আমাদের অন্তত এটুকু স্বীকার করতেই হবে যে আমাদের দুঃখের কারণ কোন দেব দেবী বা পরমেশ্বর নয়, আমাদেরই সঞ্চিত কর্ম-সংস্কার। তথাপি আশা করি যে এমন একজন সর্বশক্তিমান ও করুণাসাগর আছেন যাঁকে কোন প্রকারে প্রসন্ন করতে পারলে আমরা হাজার দূষিত কর্ম করলেও আমাদের সব দুঃখ চলে যাবে। এই আশা করে সেই অদৃশ্য শক্তির উদ্দেশ্যে পূজা-নৈবেদ্যর তোষামোদ নিবেদন করতে থাকি। আমরা বুঝতে পারি না যে আমরা কি করছি। অন্ধভক্তির ভাবাবেশে আমরা যে ভগবানের সৃষ্টি করেছি সেই বেচারাকেই কিভাবে মৃত্তিকা-লিপ্ত করছি। এই ভগবান কিরকম যিনি মান-সম্মান পেলে প্রসন্ন হন। অতিশয়োক্তিপূর্ণ প্রশংসা-প্রশস্তির ফলে ফুলে একেবারে ঢোল হয়ে যান, 'আজ্ঞে হুজুর'কারী তোষামোদী লোকের উপর কৃপাদৃষ্টি রাখেন, পূজা-ভেট প্রদানকারীর উপর কৃপা বর্ষণ করেন, নিজের প্রশংসাকারীর উপর প্রসন্ন হয়ে তার কলুষকেও নির্মল করে দেন, প্রবঞ্চক অপরাধীকেও নিরপরাধ ব্যক্তির সমকক্ষ করেন! এই 'অহং এর পুতুল' এমনই যে যদি কেউ ভুলেও তাঁর নাম নিয়ে ফেলে তিনি তক্ষুণি তাকে উদ্ধার করতে তৎপর হন। নিজের নামে ঐ ভগবানের এমনই আসক্তি। আর এমনই আসক্তি তাঁর নিজের সম্প্রদায়ের প্রতি। যিনি যে সম্প্রদায়ের ভগবান তিনি সেই সেই

সম্প্রদায়ের ব্যক্তির পক্ষ অবলম্বন করেন। এভাবে আমরা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিভিন্ন পক্ষপাতী ভগবান সৃষ্টি করেছি। আরে, কোন সীমা আছে আমাদের এই পাগলামির! প্রকৃতই কি এই বিশাল বিশ্বের ব্যবস্থা এমন কোন শাসক বা শাসককুলের হাতে আছে যিনি বা যাঁরা পক্ষপাতী, দাম্ভিক, নিরংকুশ এবং সমস্ত নিয়ম-কানুন, ধর্ম বিধানকে ভেঙে দিয়ে যথেচ্ছাচারী হবেন, যিনি দুর্গুণেই পরিপূর্ণ?

যদি মানতেই হয়, তাহলে এরূপ দুর্গুণসম্পন্ন দেবতার পরিবর্তে কোন সদ্‌গুণসম্পন্ন দেবতাকেই মানা উচিত। তাহলে তাঁর সেই সকল সদ্‌গুণ চিন্তা করে, তার থেকে প্রেরণা পেয়ে ভক্ত স্বয়ং সর্বগুণসম্পন্ন হওয়ার কাজেতো লেগে যেতে পারে! এতে তো কল্যাণই সাধিত হোত! কিন্তু নিজের পাগলামিতে আমরা নিজেদেরই অমঙ্গল সাধন করতে শুরু করেছি। চিত্তবিশুদ্ধির দ্বারাই দুঃখমুক্তি হয়—এই বিধানকে স্বীকার করেও চিত্ত বিশুদ্ধ হোক বা না হোক এই বিধানকে ছেড়ে আমরা কোন নিরংকুশ বিধায়ককে স্তুতি প্রশংসাদির দ্বারা প্রসন্ন করার পাগলামিতে মেতে গেছি।

ধর্মদর্শনের অভ্যাস আমাদের এই ভ্রান্তি থেকে বাইরে নিয়ে আসে। দুঃখের কারণ হচ্ছে চিত্তেরই দূষণ এবং এই দূষণ থেকে চিত্ত বিমুক্ত হওয়াই দুঃখবিমুক্তি। প্রকৃতির এই অটল নিয়ম-বিধান যতটা স্পষ্ট হতে থাকবে ততটা চিত্ত-বিশুদ্ধিকেই একমাত্র লক্ষ্য মনে করে আমরা ধর্মপথে আরূঢ় হতে পারবো। তখন বিধান পালনই আমাদের কাছে মুখ্য হয়ে দাঁড়াবে, আর সবই গৌণ হয়ে যাবে। তখন এই বিধানই হবে বিধায়ক, নিয়মই হবে নিয়ামক, সত্যই হবে নারায়ণ, ধর্মই হবে ঈশ্বর। বিধান, নিয়ম, সত্য এবং ধর্মকে বাদ দিয়ে তার অতিরিক্ত কোন নারায়ণকে প্রসন্ন করার কথাও মনে স্থান পাবে না। আমরা বুঝবো যে ধর্মচ্যুত হলে মহা অমঙ্গল এবং ধর্ম ধারণ করলে পরম মঙ্গল।

সত্যকেই ঈশ্বর মনে করে তার প্রতি সবিবেক শ্রদ্ধা রেখে যখন আমরা ধর্মদর্শনের অভ্যাস করি, তখন বাস্তবিকই যতটা ধর্মদর্শন অর্থাৎ সত্যদর্শন হয় ততটাই আমরা দুঃখবিমুক্ত হই। ঐ অবস্থাতে অনন্ত প্রকৃতির সূক্ষ্মতর সত্যগুলোর সাথে আমরা একাত্ম হতে থাকি এবং

প্রকৃতির এই সত্য নিজের নিয়মে বদ্ধ হওয়াতেই তা নিজেই আমাদের রক্ষা করতে শুরু করে। ধারণ করলে ধর্মও স্বতঃই আমাদের রক্ষা করে। এইজন্য কাউকে খোশামোদ করতে হয় না। এটাই ধর্মের চিরন্তন নিয়ম। যখন আমাদের মন দুর্গুণে পরিপূর্ণ হয় এবং দূষিত মনোবৃত্তিসমূহের তরঙ্গ উৎপন্ন করে, তখন সমস্ত বিশ্বে ব্যাপ্ত দূষিত তরঙ্গে সঙ্গে একাত্ম হয়ে আমরা দুর্গুণের এবং দুঃখের মাত্রা বাড়াতে থাকি। ঠিক সেই রকম যখন আমাদের মন দুর্গুণ থেকে মুক্ত হয়ে নির্মল হয়, সদ্গুণে পরিপূর্ণ হয়, সদ্বৃত্তির তরঙ্গ সৃষ্টি করতে শুরু করে, তখন অনন্ত বিশ্বে পরিব্যাপ্ত দৃশ্য অদৃশ্য প্রাণিজগতের, সাত্ত্বিক দেব-ব্রহ্ম কুলের শুদ্ধ ধর্মময়ী সাত্ত্বিক তরঙ্গ আমাদের সঙ্গে এসে মিলিত হয়, আমাদের শক্তি প্রদান করে এবং আমাদের সুখবৃদ্ধি করে, সংরক্ষণ করে। এটাই নিয়ম—এটাই বিধান—যা প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করা যায়।

কোনও দেশের রাজ্যবিধান সেই দেশের ধর্ম—সেই রকম এই ধর্মবিধান সার্বদেশিক, সর্বজনীন, সার্বকালিক বিশ্ববিধান, বিশ্বধর্ম। যখন দেশের নাগরিক ঐ রাজ্যবিধান অনুসারে জীবন যাপন করে, বিধানকে ভাঙে না তখন বিধায়কেরও কুপিত হওয়ার কোন ভয় থাকে না। দ্বিতীয়তঃ অযাচিতভাবেই তার যাবতীয় সুরক্ষার দায়িত্ব ঐ রাজ্যেরই। কিন্তু যে নাগরিক সেই বিধানকে, রাজ্যের আইনকে পদে পদে ভাঙে এবং বিধায়ক বা শাসককে তুষ্ট রাখার জন্য তাঁর খোশামোদ করে এবং তাঁর পূজা করতে থাকে —তখন সেই নাগরিক শুধু নিজের নয় বরং সমস্ত দেশ এবং সমাজের সুখ-শান্তি ও ব্যবস্থার ক্ষেত্রে বিপজ্জনক বলে প্রমাণিত হয়। আর যে দেশের লোক রাজ্যের নিয়মকানুনকে সজাগ হয়ে পালন করে সেই দেশে এবং সমাজে সুখ-শান্তি বিরাজ করবেই। এইভাবে এই বিশাল বিশ্বরাজ্যেও বিশ্ববিধানরূপী ধর্মপালন ব্যতীত সুখ-শান্তি লাভ করার অন্য কি উপায় থাকতে পারে?

সেইজন্য, শুধু নিজের সুখ-শান্তির জন্য নয়, সকলের সুখ-শান্তির জন্য ধর্ম ধারণ করুন। বিশ্ববিধানের অনুকূলে জীবনযাপন করুন এবং অটুট নিষ্ঠার সঙ্গে ধর্মদর্শনের অভ্যাসের দ্বারা চিত্তকে বিকারমুক্ত করার

কাজে লেগে পড়ুন। এই অভ্যাসে যত বাধাই আসুক না কেন,—সেই বাধা যতই প্রিয় হোক না কেন, নিজের চিরাচরিত সংস্কারের অনুকূলই বা হোক না কেন,—সেগুলোকে নির্মমভাবে দূর করে অনন্য মনে চিত্তবিশুদ্ধির জন্য প্রযত্ন করুন, প্রচেষ্টা চালিয়ে যান। অনন্তের কণায় কণায় প্রকাশিত মঙ্গলময় পরম সত্যের এটাই বিধান।

সত্য ধর্ম জগদীশ

কুদরত কা কানুন হ্যয়, কৃপা করে না ক্রোধ।
বিকৃত মন হোওয়ে দুখি, হোয় সুখি চিতশোধ।।

কিসকো পূজূঁ হবি করুঁ? কোন দেবতা ঈশ?
ম্যাঁয়তো পূজূঁ সত্য কো, সত্য ধর্ম জগদীশ।।

ঋত ছুটা অনৃত রহা, রচিয়া বনা প্রধান।
ঋত-রচিয়া কে ফের মেঁ, ঋত ভূলা নাদান।।

ক্যা ঈশ্বর পূজন করে? ধর্ম রহে না পাস।
ক্যা ঈশ্বর পূজন করে? ধর্ম রহে যদি পাস।।

শীল পালনা কঠিন হ্যয়, ঈশ ভজন আসান।
শীল ছোড় ঈশ্বর ভজেঁ, কিতনে জন নাদান।।

ধর্ম পালনে মেঁ জহাঁ, জো জো বাধক হোঁয়।
চাহে যিতনে প্রিয় লগেঁ, ত্যাগে নির্মম হোয়।।

১৯
বিপশ্যনা কেন?

মনমে মৈত্রী করুণ রস, বাণী অমৃত ঘোল।
জন জন কে হিত কে লিয়ে, ধর্ম বচন হী বোল।।

শান্তি এবং স্বস্তি কে না চায়, যেহেতু সমগ্র জগত অশান্তি এবং উত্তেজনায় ছেয়ে গেছে! শান্তি পূর্বক বাঁচা যদি আয়ত্ত হয়, তাহলে জীবন-যাপনের শৈলীও হাতের মুঠোর মধ্যে এসে যাবে। প্রকৃত ধর্ম বাস্তবিকই জীবন যাপনেরই উপায়—যার দ্বারা আমরা নিজেও সুখ-শান্তিতে বাঁচতে পারি, অন্যদেরও সুখ-শান্তিতে বাঁচতে দিতে পারি। শুদ্ধ ধর্ম এটাই আমাদের শিক্ষা দেয়—এজন্য এই শুদ্ধ ধর্ম সর্বজনীন, সার্বকালিক এবং সার্বভৌমিক। সম্প্রদায় ধর্ম নয়। সম্প্রদায়কে ধর্ম বলে মানা প্রবঞ্চনা মাত্র।

বুঝে দেখুন, ধর্ম কিভাবে শান্তি দেয়?

প্রথমে জানা দরকার আমরা অশান্ত এবং চঞ্চল কেন হই? গভীর ভাবে চিন্তা করলে অবশ্যই বোঝা যাবে যে যখন আমাদের মন বিকারের দ্বারা বিকৃত হয়ে ওঠে তখন তা অশান্ত হয়ে যায়। ক্রোধ, লোভ, ভয়, ঈর্ষা বা এ জাতীয় কোন কিছুর দ্বারা মন অশান্ত হতে পারে। তখন বিক্ষুব্ধ হয়ে আমরা ভারসাম্য বা সমতাকে হারিয়ে বসি। অতএব এর চিকিৎসা কি যাতে ক্রোধ, ঈর্ষা, ভয় ইত্যাদি একেবারে না আসে, বা এলেও তার দ্বারা আমরা অশান্ত হয়ে না উঠি?

এই বিকার কেন আসে? অধিকাংশক্ষেত্রে কোন অপ্রিয় ঘটনার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ আসে। তাহলে এটা কি সম্ভব যে সংসারে থাকব অথচ কোন অপ্রিয় ঘটনা ঘটবে না? কোন প্রতিকূল পরিস্থিতি উৎপন্ন

হবে না? না, এটা কারও পক্ষে সম্ভব নয়। জীবনে প্রিয়-অপ্রিয় উভয় প্রকার পরিস্থিতি আসতেই থাকবে। তবে চেষ্টা করতে হবে যাতে বিষম পরিস্থিতি উৎপন্ন হলেও আমরা নিজের মনকে যেন শান্ত রাখতে পারি, ভারসাম্য বজায় রাখতে পারি। রাস্তায় কাঁটাকাঁকর তো থাকবেই। উপায় হতে পারে যে আমরা জুতো পরে চলবো। রোদ বৃষ্টি থাকবেই তবে ছাতা নিয়ে আমরা তা থেকে বাঁচতে পারি। তাহলে প্রতিকূল পরিস্থিতি থাকলেও আমরা নিজেই নিজেদের সুরক্ষা করতে শিখতে পারি।

সুরক্ষা এতেই আছে, কেউ আমাকে গালি দিল, অপমান করলো— তাহলেও ক্ষুব্ধ না হয়ে আমি নির্বিকার থাকবো। এখানে একটা কথা বিচার্য যে— কোন ব্যক্তি অযোগ্য ব্যবহার করলে তার দোষে আমার মধ্যে ক্ষোভ, বিকার কেন উৎপন্ন হয়, এর কারণ আছে আমাতে, অর্থাৎ আমার অচেতন মনে সঞ্চিত অহংকার, আসক্তি, বিদ্বেষ, মোহ আদি গ্রন্থির সঙ্গে উক্ত প্রতিকূল ঘটনার সংঘাত হলে ক্রোধ, দ্বেষ ইত্যাদি বিকার চেতন মনে প্রতিফলিত হয়। এইজন্য যে ব্যক্তির অন্তর্মন পরম শুদ্ধ, এইরূপ ঘটনাতেও তাঁর মনে কোন বিকার বা অশান্তি উৎপন্ন হতে পারে না। তবে প্রশ্ন হচ্ছে যতদিন অন্তর্মন পরম শুদ্ধ না হয় ততদিন কি করণীয়? মনে তো পূর্ব সঞ্চিত সংস্কারমল আছেই—তার উপর এগুলোর সঙ্গে কোন অপ্রিয় ঘটনার সম্পর্ক হলেই নতুন নতুন বিকার সৃষ্টি হয়। এই অবস্থায় কি করণীয়?

একটা উপায় তো আছেই যে যখন মনে কোন বিকার উৎপন্ন হয়, তাকে অন্যদিকে সরিয়ে দিতে হবে। অর্থাৎ অন্য কোন চিন্তা বা কাজে মনকে লাগাতে হবে—যাতে মন ঐ স্থিতি থেকে পালিয়ে আসে। কিন্তু এই উপায়ও যথার্থ নয়! যে মনকে আমরা এক বিষয় থেকে সরিয়ে অন্য বিষয়ে নিয়ে আসছি— সে মন তো উপরের চেতন মন। ভিতরের অচেতন বা অর্ধচেতন মন তো ভিতরে ভিতরে ক্ষুব্ধ হয়ে মুঞ্জের দড়ির মত শক্ত হয়ে গাঁট বাঁধতে থাকে। ভবিষ্যতে ঐ গাঁট চেতন মনে উঠে

এসে অশান্তি ও চাঞ্চল্য উৎপন্ন করে। অতএব, পলায়নের দ্বারা সমস্যার সঠিক সমাধান হবে না। রোগের যথাযথ চিকিৎসা হ'ল না।

আনুমানিক আড়াই হাজার বছর আগে এই দেশে এই সমস্যারই সমাধান খুঁজেছেন 'ভগবান' গৌতম বুদ্ধ এবং মানুষের কল্যাণের জন্য তা সকলের পক্ষে সুলভ করেছেন। তিনি নিজের অনুভূতির দ্বারা এটা জেনেছেন যে অপ্রিয় বিকার থেকে পালিয়ে না গিয়ে সেই পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হবে। কোন কারণে কোন বিকার উৎপন্ন হলে তাকে যথাযথ ভাবে দেখতে হবে। ক্রোধ উৎপন্ন হলে তা যেমন আছে ঠিক তেমন ভাবে দেখতে হবে। দেখেই চলুন। দেখবেন ক্রোধ আস্তে আস্তে শান্ত হতে আরম্ভ করেছে। এ ভাবে যে কোন বিকার উৎপন্ন হলে তাকে যথাযথ ভাবে দেখতে থাকলে সেই বিকারের শক্তি ক্রমশঃ ক্ষীণ হতে থাকবে। কিন্তু মুস্কিল হচ্ছে এই যে—যখন সেই বিকার উৎপন্ন হয়, তখন আমাদের আর হুঁশ থাকে না। ক্রোধ উৎপন্ন হলে আমরা জানতে পারি না যে ক্রোধ উৎপন্ন হয়েছে। ক্রোধ চলে যাওয়ার পরে হুঁশ হয় যে, আমার মধ্যে ক্রোধ এসেছিল। তখন অনুশোচনা হয়—ভুল হয়ে গেছে যে রাগের মাথায় গালিগালাজ করেছি, বা মারপিট করতে উদ্যত হয়েছি। ক্রোধবশতঃ কৃতকর্মের জন্য পরে অনুশোচনা হয়। কিন্তু দেখা যায় তৎসত্ত্বেও দ্বিতীয়বার অনুরূপ ঘটনা ঘটলে আমরা আবার অনুরূপ কাজই করে ফেলি। প্রকৃতপক্ষে ক্রোধ এলে আমাদের হুঁশ থাকে না, পরে হুঁশ এলে অনুশোচনা করে কোন লাভ হয় না। চোর যখন এল, তখন শুয়ে রইলাম। কিন্তু চোর ঘরের জিনিসপত্র চুরি করে পালাবার পর তাড়াতাড়ি তালা লাগিয়ে লাভ কি? সাপ পালিয়ে যাবার পর লাঠি পিটলে কি লাভ? মনে বিকার যখন জাগে তখন হুঁশ কে এনে দেবে? প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের সঙ্গে সচেতক রূপে কোন সহায়ক রাখতে পারে কি? এটা সম্ভব নয়। মনে করুন সহায়ক রাখা সম্ভব হল, কেউ নিজের জন্য একজন সহায়ক নিযুক্ত করলো—আর যথাসময়ে সহায়ক তাকে সচেতন করে দিল—'আপনার মধ্যে ক্রোধ আসছে, ক্রোধকে দেখুন।' কিন্তু মুশকিল হচ্ছে অমূর্ত

ক্রোধকে একজন কিভাবে দেখতে পাবে? যখন ক্রোধকে দেখার চেষ্টা করে তখন যে কারণে ক্রোধ উৎপন্ন হয়েছে সেই অবলম্বন বারবার মনে উদিত হয় এবং অগ্নিতে ঘৃতাহুতির কাজ করে। ইহাই হচ্ছে উদ্দীপনা। ঐ ঘটনা নিয়েই চিন্তা করতে থাকলে বিকার থেকে মুক্তি কি ভাবে হবে? বরং এতে সেই বিকার বেড়েই যাবে। অতএব, এক বড় সমস্যা হচ্ছে এই যে, অবলম্বন থেকে মুক্ত হয়ে অমূর্ত বিকারকে সাক্ষীভাবে কিভাবে দেখা সম্ভব?

অতএব, আমাদের সামনে সমস্যা দুটি। এক ঃ বিকার উৎপন্ন হবার সময় আমরা সচেতন কিভাবে হবো? দুই ঃ সচেতন হয়ে গেলে অমূর্ত বিকারের সাক্ষীভাবে নিরীক্ষণ কিভাবে করবো? 'ভগবান' বুদ্ধ গভীরভাবে প্রকৃত সত্য সন্ধান করে দেখেছেন যে কোনও কারণে মনে যখন কোন বিকার উৎপন্ন হয়, তখন একে তো শ্বাসের গতির মধ্যে অস্বাভাবিকতা আসে এবং দ্বিতীয়তঃ শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গে কোন না কোন প্রকারের অতি সূক্ষ্ম জীব-রাসায়নিক ক্রিয়া হতে থাকে। যদি এই দুটোরই দেখার অভ্যাস করা হয়, তাহলে পরোক্ষ ভাবে নিজের মনের বিকারকে দেখার কাজ শুরু হয়ে যায় এবং বিকার স্বতঃই ক্ষীণ হয়ে নির্মূল হতে সুরু করে। শ্বাসকে দেখার অভ্যাসকেই 'আনাপানসতি' বলে এবং শরীরে ঘটে চলা জীব-রাসায়নিক প্রতিক্রিয়াকে সাক্ষীভাবে দেখার অভ্যাসকেই বিপশ্যনা বলে। উভয়ই একে অন্যের সহিত গভীরভাবে জড়িত। উভয়েরই অভ্যাস ভাল করে হয়ে যাবার পর চিত্তে কোন কারণে যখন কোন বিকার উৎপন্ন হয়, তখন প্রথম সুবিধে এই হবে যে শ্বাসের বদলে যাওয়া গতি এবং শরীরে উৎপন্ন কোন প্রকার জীব-রাসায়নিক প্রক্রিয়া আমাদের সচেতন করে দেবে, চিত্তধারায় কোন এক বিকার উৎপন্ন হচ্ছে। তখন শ্বাস এবং সূক্ষ্ম সংবেদনাকে দেখতে থাকলে স্বভাবতঃই ঐ সময়ে উৎপন্ন বিকারের উপশমন ও উন্মূলন হতে থাকবে। যে সময় আমরা শ্বাসের গ্রহণ ও ত্যাগকে সাক্ষীভাবে দেখি অথবা শরীরের জীব-রাসায়নিক বা বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় প্রতিক্রিয়াকে সাক্ষীভাবে দেখি, তখন

বিকার উৎপন্নকারী অবলম্বনের সঙ্গে সহজেই সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়। এ রকম হওয়ার অর্থ পরিস্থিতি থেকে পলায়ন নয়। কারণ অন্তর্মন পর্যন্ত ঐ বিকার যে চাঞ্চল্য উৎপন্ন করে দিয়েছে সেই সত্যের অভিমুখ হয়ে দেখা হতে থাকে। সতত অভ্যাস দ্বারা এভাবে নিজেকে নিজে দেখার এই বিদ্যা যতটা পুষ্ট হয় ততটাই স্বভাবে দাঁড়িয়ে যায় এবং ধীরে ধীরে এই স্থিতি আসে যে কোন বিকার আর উৎপন্ন হয় না, উৎপন্ন হলেও বেশীক্ষণ স্থায়ী হতে পারে না, আর হলেও গভীর রেখাপাত করতে পারে না। বরং জল বা বালির উপর অঙ্কিত রেখার ন্যায় রেখাপাত করে যা সহজেই মিলিয়ে যায়। সংস্কার যত গভীর হবে ততই দুঃখদায়ক হবে এবং বন্ধন কারক হবে। যত শক্তিতে এবং যত বেশীক্ষণ কোন বিকারের প্রক্রিয়া চলে, অন্তর্মনে তার তত গভীর রেখাপাত হয়। অতএব, কাজের কথা এই যে, বিকার যখনই উৎপন্ন হতে চলেছে, তখনই সাক্ষীভাবে পর্যবেক্ষণ করে এর শক্তি ক্ষীণ করে দেওয়া দরকার যাতে অধিক সময় ক্রিয়াশীল থেকে তা মনের বেশী গভীরে প্রবেশ করতে না পারে, আগুন লাগার সঙ্গে সঙ্গেই যেমন জল ঢালা হয়। এই রকম যেন না হয় যে পেট্রোল ঢেলে সেই আগুনকে বাড়িয়ে দেওয়া হল। বিকার উৎপন্ন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাকে দেখতে শুরু করা আগুন জ্বলে ওঠা মাত্র জল ঢেলে দেওয়ার মতই, আর যাকে অবলম্বন করে বিকার উৎপন্ন হয়েছে বার বার তার কথা চিন্তা করা আগুনে পেট্রোল ঢেলে দেওয়ার মতো। অপমানের মতো অপ্রিয় ঘটনাকে বার বার স্মরণ করে আমরা ঐ দ্বেষের সংস্কারকে আরও গভীর করে ফেলি—তখন তা থেকে বেরিয়ে আসা কঠিন হয়ে পড়ে।

প্রকৃতির যে নিয়ম তাই ঋত, তাকেই আমরা ধর্ম বলি। প্রকৃতির এই নিয়ম—যখন আমাদের মনে কোন বিকার জাগে, তখন আমরা অশান্ত হয়ে পড়ি। আর বিকার থেকে মুক্ত হলেই অশান্তি থেকে মুক্ত হই। সুখ শান্তি ভোগ করি। প্রকৃতির এই নিয়মকে জেনে বিকার থেকে মুক্ত হওয়ার কোন উপায় মহাপুরুষরা ধর্মের আকারে দুঃখার্তদের দিয়ে

থাকেন। কিন্তু নিজেদের পাগলামির জন্য ঐ উপায়কে গ্রহণ না করে বা ধর্ম ধারণ না করে আমরা তাকে বাদ-বিবাদের বিষয় বানিয়ে সিদ্ধান্তের লড়াই শুরু করি এবং কেবল দার্শনিক বুদ্ধিবিলাসের দ্বারা পারস্পরিক বিদ্রোহ বাড়িয়ে নিজের ক্ষতি করে থাকি।

বিপশ্যনা দার্শনিক সিদ্ধান্তের সংঘর্ষ নয়। প্রত্যেক ব্যক্তি জ্ঞানচক্ষু দ্বারা নিজে নিজেকে দেখবেন। নিজের মনের ভেতরে যখন বিকারের আগুন লাগে তখন তাকে নিজে দেখে নিভিয়ে দিতে হবে। এটাই হচ্ছে সম্যক্ দর্শন। এটাই হচ্ছে 'নিজেকে দেখা'। জ্ঞানচক্ষু দ্বারা নিরীক্ষণ। অনুভূতির স্তরেই সত্যের দর্শন হয়ে থাকে। তাই, সজাগ থেকে যথাযথ সত্যকে দেখার অভ্যাসই হচ্ছে বিপশ্যনা। বিপশ্যনাকে বুদ্ধি-বিলাসের বিষয়ে পরিণত করে কোন লাভ নেই। পড়া, শোনা, চর্চা-পরিচর্চা দ্বারা বুদ্ধির স্তরে হয়ত এর বিষয়কে বোঝা সম্ভব হতে পারে। তার দ্বারা কোন প্রেরণাও পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু বাস্তবিক লাভ হবে কেবলমাত্র অভ্যাসের দ্বারা। অতএব নিজের মনকে বিকার দ্বারা বিকৃত হতে না দিয়ে সর্বদা সচেতন থেকে নিজেকে দেখতে থাকুন। বিনা অভ্যাসে এটা সম্ভব নয়। জন্মজন্মান্তর ধরে মনের মধ্যে যে সকল সংস্কার, বিকার স্তরে স্তরে পুঞ্জীভূত হয়েছে এবং নতুন নতুন বিকার উৎপন্ন করার যে স্বাভাবিক প্রবণতা সৃষ্টি হয়েছে, তার থেকে মুক্তি পেতে হলে সাধনার অভ্যাস অত্যন্ত প্রয়োজন। কেবল তত্ত্বের স্তরে তাকে জানা যথেষ্ট নয়। কেবল ১০ দিনের শিবিরে যোগদানও যথেষ্ট নয়। নিরন্তর অভ্যাসের আবশ্যকতা আছে।

মাত্র ১০ দিনের অভ্যাসের দ্বারা কারও পক্ষে পারঙ্গম হওয়া সম্ভব নয়। ১০ দিনে কেবল ভবিষ্যতে যা করতে হবে তার বিধি জেনে নেওয়া সম্ভব হতে পারে। চর্চা কিন্তু সারা জীবন ধরে চালিয়ে যেতে হবে। চর্চা যতই বাড়বে, জীবনে ধর্মের প্রতিফলন ততই গভীর হবে। জীবন যাপনের শৈলী পুষ্ট হবে। আত্ম-সচেতনতা বাড়লে আচরণ শুদ্ধ হয়, চিত্ত নির্মল হয় এবং নির্বিকার হয়। নির্মল-নির্বিকার চিত্ত মৈত্রী, করুণা,

মুদিতা এবং সমতার সদ্‌গুণ দ্বারা স্বভাবতঃই পূর্ণ হয়। সাধক স্বয়ং ত কৃতকৃত্য হন-ই, সমাজের জন্যও তিনি সুখ-শান্তির কারণ হয়ে থাকেন।

আমাদের সৌভাগ্য যে, এই আত্ম-নিরীক্ষণ বা স্ব-নিরীক্ষণের অভ্যাস, বিপশ্যনা সাধনা-বিধি ব্রহ্মদেশে আড়াই হাজার বছর আগে থেকে আজ পর্যন্ত শুদ্ধ রূপে বর্তমান আছে। আমারও সৌভাগ্য যে এই বিধি শেখার কল্যাণকারী সুযোগ আমি পেয়েছি। শারীরিক ব্যাধির সাথে সাথে মানসিক বিকার এবং আসক্তির ব্যাধি থেকে মুক্তির রাস্তা খুঁজে পেয়েছি। বাস্তবিকই এক নতুন জীবন লাভ করেছি। ধর্মের মর্মজীবনে প্রবেশ করার এক মঙ্গলময় বিধি পেয়েছি। এই বিধি এই দেশেরই পুরাণো নিধি। পবিত্র সম্পদ! কোনও কারণে এখানে বিলুপ্ত হয়ে ছিল। আমি তো ভগীরথের মতো এই হারানো ধর্মগঙ্গা ব্রহ্মদেশ থেকে এই দেশে পুনরায় নিয়ে এসেছি মাত্র—এজন্য আমি নিজেকে অত্যন্ত ভাগ্যবান বলে মনে করছি।

মনে পড়ে মানসিক বিকার দ্বারা বিকৃত হয়ে আমি কত দুঃখ ভোগ করেছি। আর বিকার থেকে মুক্তি পেয়ে কতই না দুঃখমুক্ত হয়েছি। সুখ লাভ করেছি। এইজন্য আমি চাই যে আরও অধিক লোক যাঁরা নিজেদের বিকারের দ্বারা বিকৃত এবং সে জন্য দুঃখ ভোগ করেছেন, তাঁরা এই কল্যাণকারী বিধির দ্বারা বিকারমুক্ত হওয়ার উপায় শিখে নিন এবং দুঃখ-মুক্ত হয়ে সুখলাভ করুন!

মনে পড়ে যখন আমি বিকারগ্রস্ত হয়ে দুঃখ অনুভব করতাম, তখন নিজের দুঃখ শুধু নিজের মধ্যেই সীমিত রাখতাম না, অন্যদেরও দুঃখের ভাগী করতাম। আমার সঙ্গে সঙ্গে অন্যরাও কষ্ট পেতো। কারণ তখন অন্যদের দেবার মতো কিছুই ছিল না, কেবল দুঃখ ছাড়া। কাজেই এখন আমি চাই—এই কল্যাণকারী বিধির দ্বারা নিজে যত প্রকার বিকার থেকে মুক্ত হয়েছি এবং ফলতঃ যতটুকু সুখ-শান্তি পেয়েছি—তা জনসাধারণের কাছে বিতরণ করবো। এই বিতরণের দ্বারা সুখবৃদ্ধি হয়, মন প্রসন্ন হয়।

১০ দিনের শিবিরে মানুষ বিমর্ষ চেহারা নিয়ে আসেন, এবং শিবিরের পরে প্রফুল্ল মুখে বাড়ী ফিরে যান—তা দেখে আমার আনন্দে মন ভরে যায়। আরও বেশি লোক এই মঙ্গলকারী বিপশ্যনা সাধনার দ্বারা উপকৃত হোন, সুখসমৃদ্ধ হোন! বহু বহু লোকের ভাল হোক, কল্যাণ হোক, মঙ্গল হোক, ইহাই আমার ধর্ম কামনা। ভবতু সব্ব মঙ্গঁলং!

প্যায়াসা পায়ে ধর্মরস

পাপ হোয় ঝট রোখ লে, করে ন বারংবার।
ধর্মবান জাগ্রত রহে, অপনি ভুল সুধার।।

দেখেঁ মন কি গন্দগি, দেখেঁ মন কে দোষ।
দেখত দেখত দেখতে, হোএ মন নির্দোষ।।

মনমে উঠে বিকার জব, অভিমুখ হোকর দেখ।
অনাসক্ত হো দেখতে, রহে ন দুখ কী রেখ।।

জব জব উঠে বিকার মন, সাঁস বিষম হো জায়।
হলচল হোয় শরীর মেঁ, দেখ দেখ মিট জায়।।

ব্যাকুল হী হোতা রহা, দেখ পরায়ে দোষ।
লগা দেখনে দোষ নিজ, তব সে আয়া হোশ।।

প্যায়াসা পাএ ধর্মরস, অমৃত কী-সী ঘুঁট।
নির্ধন পাএ ধর্মধন, জায় দুখোঁ সে ছুট।।

২০

আসুন, সুখ বন্টন করি

সারা জীবন ধরে আমরা তো মানুষকে কত দুঃখই দিয়েছি!

নিজের মূর্খতাবশতঃ যখনই মনে বিকার উৎপন্ন হয়েছে তখনই মন দৌর্মনস্যে ভরে গেছে; এবং শুধু মন দিয়েই নয় বাক্ এবং কায়া দিয়েও এমন দুষ্কর্ম করেছি যাতে লোক দুঃখী, সন্ত্রস্ত এবং সন্তপ্ত হয়েছে! কত লোকের দুঃখের কারণ আমরা হয়েছি! কতজনের ব্যাকুলতার কারণ হয়েছি! আমরা তো লোকদের শুধু দুঃখ, শুধু দুঃখই দিয়েছি!

এখন নিজের কোন অতীত পুণ্যের প্রভাবে এই সর্বজনীন অসাম্প্রদায়িক অমূল্য এবং মঙ্গলকারী ধর্মরত্ন আমরা পেয়েছি। এই ধর্মসম্পদ আমাদের কতই না সম্পন্ন করে দিয়েছে। আমাদের কত বিপন্নতাকে দূর করে দিয়েছে! কত বিকার থেকে আজ আমরা মুক্ত হয়েছি। কত দুঃখ থেকে মুক্তি পেয়েছি। অপ্রিয় পরিস্থিতিতেও এখন হাসতে পারি! মনে মৈত্রী এবং করুণার ঢেউ নিয়তই প্রবাহিত হয়! জীবন ধন্য হয়েছে! এটাই তো সুখ! এটাই তো প্রকৃত সুখ!

আসুন, আমরা এই সুখ সকলের কাছে বিতরণ করি। এই সুখ সকলেই প্রাপ্ত হোন। এই ধর্ম সকলেই লাভ করুন। জগতে যেন কোন দুঃখী না থাকে। সকলেই নিজ নিজ বিকার থেকে মুক্ত হোন। মনের গিঁট খুলে যাক, মালিন্য দূর হোক। সকলেই অবৈরী (শত্রুবিহীন) হোন, নির্ভয় হোন, নিরাময় হোন, নির্বিকার হোন, নিষ্পাপ হোন, নির্বাণ প্রাপ্ত হোন।

এইজন্য আসুন, সদ্ধর্মের প্রতি অসীম কৃতজ্ঞতা এবং অনন্য-নিষ্ঠার ভাব রেখে, সকল প্রাণির প্রতি অসীম মঙ্গলমৈত্রী রেখে, প্রত্যেকের এবং নিজের মঙ্গলের জন্য—আমরা সবাই মিলে নিজেদের সম্মিলিত

শক্তিকে কাজে লাগাই। এমন জীবন যাপন করি যার দ্বারা আরও অধিকতর লোক সদ্ধর্মের দিকে আকৃষ্ট হন! আরও অধিকতর দুঃখী লোক সদ্ধর্ম-রস পান করতে পারেন এবং দুঃখ-মুক্ত হতে পারেন! এইজন্য তাঁদের আমরা যতটা সেবা করা যায় যেন করতে পারি, যতটা সুবিধা দেওয়া যায় যেন দিতে পারি, যতটা সুযোগ দেওয়া যায় যেন দিতে পারি! ওঁদের যেন প্রকৃত অর্থে সুখী করতে পারি।

নিজের সুখ অন্যদের কাছে বিতরণ করার মধ্যেই আমাদের প্রকৃত সুখ নিহিত আছে—সকলের সুখ নিহিত আছে।

জন জন মঙ্গল হোয়

জন জন মেঁ জাগে ধরম; সুধরে জগ ব্যবহার।
বৈর ভাব সারা মিটে, রহে প্যার হী প্যার।।

শুদ্ধ ধর্ম য্যয়সা মিলা, ওয়সা সব পা জায়ঁ।
মেরে মন কে শান্তি সুখ, জন জন মন ছা জায়ঁ।।

সুখ ছায়ে ইস জগত মেঁ, দুখিয়া রহে না কোয়।
জন জন মেঁ জাগে ধরম, জন জন সুখিয়া হোয়।।

শুদ্ধ ধর্ম জন মেঁ জগে, দূর হোয় সন্তাপ।
নির্ভয় হোঁ, নির্বৈর হোঁ, সভি হোয় নিষ্পাপ।।

দুখিয়ারা সনসার হ্যয়, জন মন বসে বিকার।
জন জন কে মন বিমল হোঁ, সুখী হোয় সনসার।।

না কোই দুর্মন রহে, না হী দ্বেষী হোয়।
জন জন কা কল্যাণ হো, জন জন মঙ্গল হোয়।।

।। ভবতু সব্বমঙ্গলং ।।

Acharaya Shri S. N. Goenka & Smt. Illaichidevi Goenka

Sri Satyanarayanji Goenka was born in Mandalay, Myanmar in 1924. Although he topped the list of all successful candidates in the whole of Myanmar in the tenth class he could not continue his studies further. At a very early age he set up many commercial and industrial institutions and earned fabulous wealth. He also established many social and cultural centres. Because of tension he became a victim of migraine, which could not be cured by doctors of Myanmar and of other countries in the world. Then some one suggested him to take a course of Vipassana. Vipassana has done well not only to him but it has also been benefiting many others.

He learned Vipassana from Sayagyi U Ba Khin in 1955. Sitting at the feet of his teacher he practiced it for fourteen years He also studied the words of the Buddha during this period. He came to India in 1969 and conducted the first vipassana course in Mumbai. After that a series of courses were held. In 1976 the first residential course of vipassana was held in Igatpuri and the first centre of vipassana was established here. Up till now 167 centres have been established all over the world. New centres also are coming up. At these centres 1200 trained teachers teach vipassana in 59 languages of the world. Not only ten- day courses are conducted at these centres but also at some centres 20-day, 30-day, 45-day and 60-day courses are conducted. All courses are free of charge. The expenses on food and accommodation etc are met by the self-willed Dana given by those who benefited from the course. Seeing its benevolent nature vipassana courses is held not only for the inmates of jails and school children in the world but also for police personnels, judges, government officers etc.

ISBN 81-7414-298-3

VRI - B02